রোযার ফযীলত ও শিক্ষা: আমাদের করণীয়

রোযার ফযীলত ও শিক্ষা: আমাদের করণীয়

রোযা ইসলামের অন্যতম ফরয ইবাদাত। ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের কল্যাণের জন্য রোযার বিধান চালু হয়েছে। ইসলাম হচ্ছে মুসলিমের পাঁচ স্তম্ভ বিশিষ্ট ঘর। রোযা হচ্ছে সেই ঘরের তৃতীয় স্তম্ভ।

রোযার পরিচয়

رمضان শব্দটি رمض শব্দ হতে নির্গত। এর অর্থ পুড়িয়ে ফেলা। রোযা রাখলে গুনাহ মাফ হয়। রমযান গুনাহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। তাই এর নাম রমযান।

পরিভাষায় সুবহে সাদিক হতে সুর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনসম্ভোগ হতে বিরত থাকার নাম রোযা।

রমযানের রোযা কেন ফরজ করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾ [البقرة: ١٨٣]

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরয করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ এর ফলে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।”(সূরা আল বাকারা: ১৮৩)

এই আয়াতে রোযা ফরয করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার বলা হয়েছে। রোযার মূল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন। তাকওয়া শব্দটি وقى হতে। যার অর্থ বাঁচা। মহান আল্লাহ বলেন-

﴿ فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمِ ١١ ﴾ [الانسان: ١١]

‘আল্লাহ তাদেরকে ঐ দিনের ক্ষতি থেকে বাঁচিয়েছেন।’

রোযার ফযীলত

রমযানের রোযার ফযীলত অনেক। ইসলামের যে সকল ইবাদতের সওয়াব ও পুরস্কার সর্বাধিক তার মধ্যে রমযানের রোযা অন্যতম। অন্য কোনো ইবাদতের ফযীলত এতো বেশী বর্ণিত হয় নি। এখানে আমরা রমযানের রোযার ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করব।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»

'যে ঈমান ও এহতেছাবের সাথে সওয়াবের নিয়তে রমযানের রোযা রাখবে আল্লাহ তার অতীতের সকল গুণাহ মাফ করে দেবেন।' [1]

এখানে ঈমান বলতে সত্যিকার ও যথার্থ ঈমান এবং সওয়াবের নিয়ত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া লোক দেখানো কিংবা অন্য কোনো দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে রোযা না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

« كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ »

"আদম সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের জন্য ১০ থেকে ৭শ গুণ পর্যন্ত সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহ বলেন, রোযা এর ব্যতিক্রম। সে একমাত্র আমার জন্যই রোযা রেখেছে এবং আমিই নিজ হাতে এর পুরষ্কার দেবো। সে আমার জন্যই যৌন বাসনা ও খানা-পিনা ত্যাগ করেছে। রোযাদারের রয়েছে দুইটা আনন্দ। একটা হচ্ছে ইফতারের সময় এবং অন্যটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। আল্লাহর কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ মেশক-আম্বরের সুঘ্রাণের চাইতেও উত্তম।"[2]

এই হাদীসে অন্যান্য ইবাদতের সওয়াবের পরিমাণ উল্লেখ করে রোযাকে ভিন্নধর্মী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, তিনি নিজ হাতে রোযার সওয়াব দান করবেন এবং সেটা হবে প্রচলিত হিসেবে চাইতে অনেক বেশি। অর্থাৎ আল্লাহ রোযাদারকে রোযার জন্য অনেক বেশি সওয়াব, পুরষ্কার ও বিনিময় দান করবেন।

সাহল ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلن يدخل منه أحد »

'জান্নাতে 'রাইয়ান' নামক একটি দরজা আছে। রোযাদার ছাড়া আর কেউ সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রোযাদাররা প্রবেশ করলে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না।' [3]

রোযার বিশেষ ফযীলত হচ্ছে জান্নাতের রাইয়ান দরজা। এটা রোযাদারের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা। রাইয়ান শব্দটি আরবী رى এসেছে। এর অর্থ হলো চূড়ান্ত তৃপ্তি সহকারে পান করা। রোযাদাররা জান্নাতে প্রবেশের পর সুস্বাদু পানীয় পান করবে, যার ফলে কোনো দিন তারা তৃষ্ণার্ত হবে না। ইবনে খুযাইমা উপরোক্ত হাদীসের আরো একটু বর্ধিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাহলো: যারা প্রবেশ করবে, তারা পান করবে এবং যে পান করবে সে আর কোনোদিন তৃষ্ণার্ত হবে না। রোযাদারের জন্য জান্নাতের দরজা রাইয়ান নামকরণের তাৎপর্যও তাই। রাইয়ানের শাব্দিক অর্থের সাথে তাৎপর্যের মিল রয়েছে।

রোযাদারের ক্ষুধার চাইতে পিপাসার কষ্টই বেশী। তাই ক্ষুধার তৃপ্তির পরিবর্তে পানীয় পান করার তৃপ্তি উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও জান্নাতে সকল খাবারই মওজুদ রয়েছে।

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহে বিভিন্ন ইবাদতের মধ্যে রোযাকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হিসেবে চিত্রিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোযার সওয়াব অগনিত ও অসংখ্য। আল্লাহ কি পরিমাণ সওয়াব বান্দাকে দেবেন, তা তিনিই ভাল জানেন। অথচ অন্যান্য ইবাদতের সওয়াবের পরিমাণ পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেওয়ায় সবাই তা জানে। নিঃসন্দেহে রোযার বিনিময় ও পুরস্কার রহস্যময়। আমরা যেন রোযার এই রহস্যময় বিনিময় থেকে উদাসীন না থাকি।

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«عن أبي أمامة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر آخذه عنك قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له»

আমি রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ রাসূল ! আমাকে এমন একটি কাজের আদেশ দিন যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি রোযা রাখ। রোযার সমতুল্য কিছু নেই।[4]

ইবনে হিব্বান উল্লেখ করেছেন, এরপর মেহমান ছাড়া আবু উমামার ঘরে দিনে কখনও ধোঁয়া দেখা যায়নি।

অর্থাৎ তিনি রোযা রাখতেন। রমযানের রোযা ছাড়া নফল রোযাও বিরাট সওয়াব রয়েছে। আরেক বর্ণনায় এসেছে, আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন: আমাকে এমন একটি কাজের আদেশ দিন যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখার কথা বলেন।

অন্য হাদীসে রোযা রাখলে ভাল স্বাস্থ্য লাভ করা যাবে বলা হয়েছে। এটা কতইনা বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক সত্য। কতগুলো রোগের জন্য রোযা নজীরবিহীন চিকিৎসা। যেমন-মেদ ভুঁড়ি, ইত্যাদি। এগুলো থেকে বহুমুত্র, রক্তচাপ অন্যান্য রোগ দেখা দেয়। রোযা বহুমুত্র রোগীর জন্য ঈদ স্বরূপ। কেননা, এর মাধ্যমে রক্তে সুগারের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। মারাত্মক পর্যায়ের ডায়াবেটিস ব্যতীত বাদ বাকী ডায়াবেটিসের জন্য রোযা অত্যন্ত ফলদায়ক। এছাড়াও পেটের বিভিন্ন অসুখ ও বদহজমীর জন্য, আলসার ও গ্যাস্টিকের রোগীর জন্য রোযা বিশেষ উপকারী। তাছাড়া সারা বছর হজমযন্ত্রকে দীর্ঘ মেয়াদী বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব হয় না। রোযার মাধ্যমে হজম প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধিত হয়।

কোনো কোনো বর্ণনায় রোযাকে শরীরের যাকাত বলা হয়েছে। কেননা, সম্পদের যাকাতের মতো রোযাও শরীর থেকে অতিরিক্ত কিছু জিনিস বের করে দেয়। যাকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে: ১) বৃদ্ধি করা ২) পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধি অর্জন।

সম্পদের যাকাত দিলে আল্লাহ তা বাড়িয়ে দেন এবং তাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আসে। অনুরূপভাবে তার নৈতিক পবিত্রতাও অর্জিত হয়। রোযার মাধ্যমে মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং নফসের লাগামহীন চাহিদা ও খারাপ লোভ-লালসা দূর হয়। ফলে নৈতিক দিক থেকে আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটে। যদিও বাহ্যিক দিক থেকে শরীরের কিছু ঘাটতি হয় বলে মনে হয়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنْ النَّارِ»

“রোযা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ।[5]

রোযাকে ঢাল বলার কারণ হলো, যুদ্ধে ঢাল যেমন শত্রুর তলোয়ার ও তীর বল্লম থেকে যোদ্ধাকে হেফাজত করে, রোযাও তেমনি রোযাদারকে গুনাহ কাজ ও শয়তান থেকে রক্ষা করে। সত্যিকার রোযাদার তাকওয়ার অনুশীলন করতে গিয়ে হাত, পা, চোখ, কান ও নাকের রোযা রাখে। অর্থাৎ পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, যা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার সুরক্ষিত দুর্গ হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ রোযাদার জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, ‘রোযা আমার জন্য রাখা হয়’

এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ বান্দার নেক ও পাপ কাজের হিসেব নেবেন। তিনি তাদের নেকির বিনিময়ে পাপ কমাতে থাকবেন। তারপরও যদি পাপ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দেবেন এবং রোযার বিনিময়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

এখানে রোযার সওয়াবকে বিনিময়ের উর্ধ্বে রাখার কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য নেক কাজের সওয়াবের বিনিময়ে গুনাহ মাফ করা হবে। কিন্তু রোযার সওয়াব গুনাহ মাফের মোকাবিলায় নয়; বরং জান্নাতে প্রবেশের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হবে। রোযার সওয়াব ও মর্যাদা কতইনা বেশী। হাদীসে এসেছে:
রোযাদারের মুখের না খাওয়াজনিত গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের সুঘ্রাণ থেকেও উত্তম।[6]

কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লামা কাস্তাল্লানী বলেছেন, হাশরের দিন রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ সুগন্ধে পরিণত হবে এবং তা রোযাদারের বিশেষ চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হবে। বস্তুত এ ধরনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং রোযার সময় উপবাসের কারণে পেট খালি থাকার ফলে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। মানুষের কাছে তার দুর্গন্ধ ও ঘৃনিত কিন্তু আল্লাহর কাছে তা পবিত্র। কেননা আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কারণেই তা মুখ থেকে বের হয়। তাই এর এই অসাধারণ মর্যাদা।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان »

“কেয়ামতের দিন রোযা ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন চাহিদা থেকে বিরত রেখেছি, আমাকে তার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দিন। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে রাত্রে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। আমাকে তার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দিন। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের উভয়কে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে।[7]

রোযা ও কুরআন যদি বান্দার ব্যাপারে সুপারিশ করে, তাহলে হাশরের কঠিন দিনে তা অন্য যে কোনো সাহায্যকারীর চাইতে উৎকৃষ্ট হবে। যদিও সেখানে কেউ কারুর সাহায্য তো দূরে থাক, সাহায্যের নাম শুনতেও পালিয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَوۡمَ يَفِرُّ ٱلۡمَرۡءُ مِنۡ أَخِيهِ ٣٤ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ٣٥﴾ [عبس: ٣٤، ٣٥]

““সেদিন ভাই তার ভাই থেকে, মা বাবা থেকে এবং স্ত্রী স্বামী ধেকে বাচ্চারা নিজ পিতা থেকে পালিয়ে

যাবে।”

সেদিন প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। কারুর ব্যাপারে কেউ সাহায্য করতে পারবে না। হ্যাঁ, যাদেরকে আল্লাহ অনুমতি দিবেন, তারা পারবেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ »

“পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুম’আ থেকে আরেক জুম’আ এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান মধ্যবর্তী সময়ের সগীরাহ গুনাহ ক্ষতিপূরণ হবে যদি কবীরা গুণাহ না করা হয়।[8]

এই হাদীসে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং জুমআর পাশাপাশি রমযানকেও মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহর কাফফারা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ছোট গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো, কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। তওবা করলে আল্লাহ কবীরা গুণাহও মাফ করেন। রমযানের রোযা দ্বারা এক বছরের সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। সত্যিই রমযান কতই না মহান।

রমযান মাসে ক্ষমা না পাওয়ার জন্য লা‘নত

হাদীসে এসেছে,

«صعد رسول الله صلى الله عليه و سلم المنبر فلما رقي عتبة قال : (آمين) ثم رقي عتبة أخرى فقال : (آمين) ثم رقي عتبة ثالثة فقال : (آمين) ثم قال : (أتاني جبريل فقال : يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قلت : آمين قال : ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله قلت : آمين فقال : ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل : آمين فقلت : آمين »

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে আরোহন করলেন। তারপর যখন তিনি মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে বললেন, আমীন। তারপর দ্বিতীয় সিড়িতে পা রেখে বললেন ‘আমীন’। তৃতীয় সিঁড়িতে পা রেখে বললেন ‘আমিন’। তিনি মিম্বার থেকে নামার পর আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, (আমরা আপনার কাছে আজ এমন জিনিস শুনতে পেলাম যা আগে কখনও

শুনতে পাইনি।) তখন তিনি বললেন, জিব্রাইল(আ.) এসেছিলেন। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হউক, যে রমযান পাওয়া সত্বেও তার গুনাহ মাফ হয়নি, আমি তখন বললাম 'আমিন' অর্থাৎ হে আল্লাহ, কবুল করুন। দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখার পর বললেন, সেই ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হউক, যার কাছে আপনার নাম উচ্চারিত হয়েছে কিন্তু সে আপনার উপর দরুদ পাঠ করেনি। তখন আমি বলেছি 'আমিন'। তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখার পর জিব্রাইল (আ.) বললেন, সেই ব্যক্তিও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হউক, যে ব্যক্তি তার বৃদ্ধ মা-বাবা দুইজনকে কিংবা একজনকে পাওয়া সত্ত্বেও তাদের সেবা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেনি। আমি তখন বললাম, আমীন।[9]

এই হাদীস রমযানের গুরুত্ব আরো পরিস্কারভারে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ রমযান থেকে যে সকল পুরস্কার পাওয়ার কথা, তা না হলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকা ছাড়া আর কি গতি হতে পারে? রমযানে রহমত, মাগফেরাত ও নাযাত রয়েছে। রয়েছে আরো অনেক পুরস্কার আল্লাহর পক্ষ থেকে। সিয়াম ও কেয়াম ও অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে তা লাভ করা যায়। যদি কেউ সিয়াম কেয়াম ও ইবাদত না করে, তাহলে তার ভাগ্যে জিবরীল (আ.) এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বদদো'আ ছাড়া আর কি থাকতে পারে? আর এ কথা তো দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ঐ দুইজনের বদদো'আ আল্লাহর কাছে অবশ্যই কবুল হবে এবং হতভাগ্য ব্যক্তির দুর্ভাগ্য সুনিশ্চিত হবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة و غلقت أبواب النار و صفدت الشياطين»

"যখন রমযান আসে তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শিকল পরানো হয়। [10]

নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমা এবং তিরমিযী এই হাদীসটি আরো দীর্ঘায়িত করে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
রমযানের প্রথম রাতে শয়তান এবং অবাধ্য জিনকে শিকল পরিয়ে আটক করা হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয় এবং একটি বন্ধ করা হয় না। একজন আওয়াজ দানকারী এই বলে আওয়াজ দেন, হে কল্যাণ প্রার্থী। এগিয়ে এসো, হে অকল্যাণ প্রার্থী! বিরত থাকো। প্রত্যেক রাতে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে বহু লোককে মুক্তি দেন।

বায়হাকী এক রেওয়ায়াতে বলেছেন: 'দুষ্ট ও কট্টর জিনগুলোকে রমযানে আটক রাখা হয়।' এ দ্বারা বুঝা যায়, সকল শয়তানকে রমযানে আটক করা হয় না। শুধু মাত্র বেশী দুষ্টু কিংবা বড় শয়তানগুলোকে রমযানে আটক করা হয়। ছোট শয়তানগুলো আগের মতোই মুক্ত থাকে। ফলে রমযানে শয়তানের তৎপরতা ও অনিষ্ট কম থাকে কিংবা সীমিত থাকে, একেবারে বন্ধ হয় না। সে জন্য রমযানেও গুনাহর কাজ সংগঠিত হয়। কিন্তু

মুমিনরা এ মাসে নেককার হওয়ার চেষ্টা করলে শয়তানের প্রবল বিরোধীতার সম্মুখীন হবে না। কেননা নাফরমান, দুষ্টু ও বড় শয়তানগুলোকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাই এ মাসে পাপী লোকদের নেককার হওয়ার সুযোগ বেশী। মাসব্যাপী জান্নাতের দরজা খোলা এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ রেখে আল্লাহ মূলতঃ মানুষের জন্য এক নেক ও রহমতের পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

শয়তান দুই প্রকার। জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন: ‘ওয়াসওয়াসা দানকারী জিন ও মানুষ থেকে আশ্রয় চাই।’ (সূরা নাস:৬)

জিন শয়তানকে বাঁধা হলেও মানুষ শয়তানকে বাঁধার কথা বলা হয়নি। তাই রমযান মাসে মানুষ শয়তানসহ ছোট ছোট জিন শয়তানগুলো অপকর্মে লিপ্ত থাকার ফলে রমযানের পাপ কাজ অব্যাহত থাকে। কিন্তু কেউ নেক কাজ করতে চাইলে আসমানের রহমতের দরজা ও জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত এবং সেদিকে আকর্ষণের পথে বাধা কম।

রমযান হচ্ছে ধৈর্যের মাস এবং ধৈর্যের সওয়াব হচ্ছে জান্নাত। রমযান সহানুভূতির মাস। এই মাসে মুমিনের রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো রোযাদারকে ইফতার করায় তা তার গুনাহের ক্ষমা ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির উপায় হবে। সেও রোযাদারের সমান সওয়াব পাবে, কিন্তু তাই বলে রোযাদারের সওয়াবের কোনো কমতি হবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ হচ্ছে, যদি মেঘের কারণে ২৯শে শাবানের রাতে চাঁদ দেখা না যেতো, তাহলে শাবানের ৩০ দিন পূর্ণ করেই রমযানের রোযা রাখতেন। (আবু দাউদ)

বিভিন্ন ধর্মে রোযা

যুগে যুগে এই তাকওয়া অর্জনের সুযোগ ও চেষ্টা বিদ্যমান ছিল। তাই আমরা দেখি, অন্যান্য আসমানী কিতাবের অনুসারীদের উপরও রোযা ফরয ছিল। একথাই আল্লাহ বলেছেন:

[كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ ﴿ [البقرة: ١٨٣ ﴾

‘যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছিল।’[11]

অন্যান্য উম্মতের উপর কি আমাদের মতই রোযা ফরয করা হয়েছিল, না অন্যভাবে, তা আমাদের জানা নেই। হাদীসে এসেছে, দাউদ (আ) রোযা রাখতেন। তিনি একদিন পর পর বছরের ৬ মাস রোযা রাখতেন। তবে তাঁর রোযার ধরন আমাদের জানা নেই। ইহুদীরা ১০ই মুহররমে আশুরার রোযা রাখে। সেই দিন আল্লাহ মূসা (আ) কে পানিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউনকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন।

অতীতের বহু জাতি রোযা রেখেছে। পারস্য, রোমার, হিন্দু, গ্রীক, ব্যাবিলনীয় ও পুরাতন মিসরীয়রা রোযা রাখত। ক্যাথলিক গীর্জা রোযার কোনো নির্দেশ ও নীতিমালা জারি করেনি। তবে গীর্জার দৃষ্টিতে কোনো কোন সময় পূর্ণ উপবাস কিংবা আংশিক উপবাসের মাধ্যমে কিছু গুণাহ মাফ হয় এবং তা এক প্রকারের তাওবা হিসেবে গণ্য হয়। রোমান গীর্জা, মাঝে মধ্যে দিনে এক বেলা খাবার গ্রহণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আংশিক রোযার উপদেশ দেয়।

প্রাচীন খৃষ্টানরা বুধবার, শুক্রবার ও শনিবারে রোযা রাখত। তারা তাদের উপর আপতিত বিপদ মুক্তির জন্য রোযা রাখত। ৪র্থ খৃষ্টাব্দের শুরুতে খৃষ্টানদের উপর মারাত্মক নির্যাতন নেমে আসে। সে বিপদ থেকে মুক্তির জন্য নবী মূসা (আ) এর অনুকরণে তারা ৪০ দিন ব্যাপী বড় রোযা রাখত।

এছাড়াও ঐ সময়ে মানুষের মধ্যে এ ধারণা বিরাজ করে যে, মানুষের খাওয়ার সময় শয়তান শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা জরুরী, যেন শয়তানকে তাড়িয়ে নফসকে পবিত্র করা যায়। সে জন্য তারা রোযা রাখত। মথি লিখিত সুসমাচারে আছে, নামায ও রোযা দ্বারা শয়তান বেরিয়ে যায়।

প্রাচীন হিব্রুরা শোক কিংবা বিপদের মুহূর্তে রোযা রাখত। বিপদ দূর হয়ে গেলে আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ রোযা রাখত। হিব্রু ক্যালেন্ডারে আজও ক্ষমা দিবসে ইহুদীদের রোযা রাখার নিয়ম আছে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকরা বছরে কয়েকদিন একাধারে রোযা রাখত। তাদের মতে, এটা আত্মাকে বিশুদ্ধ করার উত্তম পদ্ধতি। দার্শনিক পিথাগোথ ৪০ দিন রোযা রাখতেন। তার মতে, রোযা চিন্তার সহায়ক। সক্রেটিস এবং আফলাতুনও ১০ দিন রোযা রাখতেন। প্রাচীন সিরিয়ানরা প্রতি ৭ম দিনে রোযা রাখত। আর মঙ্গোলিয়ানরা রাখত প্রতি ১০ম দিবসে। সর্বযুগেই রোযার প্রচলন ছিল।

অনুরূপভাবে, বৌদ্ধ, হিন্দু, তারকা পূজারী ও আধ্যাত্মবাদীদেরও উপবাস সাধনার নিয়ম রয়েছে। তারা বিশেষ কিছু খাবার পরিহার করে আত্মাকে উন্নত করার চেষ্টা করে। তাদের ধারণা, দেহকে দূর্বল করার মাধ্যমে আত্মা শক্তিশালী হয়। আত্মাকে সবল করার জন্য তাদের এই উপবাস প্রথার আবিষ্কার হয়েছে। মূলকথা, রোযা প্রায় সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে রয়েছে। যদিও তার ধরণ-প্রকৃতি আমাদের জানা নেই।

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রোযা

এতক্ষণ আমরা রোযার ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, রোযার ফযীলত ও মর্যাদা কত অসীম। এখন আমরা এর পাশাপাশি ব্যাপকার্থে রোযার ধারণা সম্পর্কে আরেকটি হাদীস আলোচনা করবো যা প্রতিটি রোযাদার মুসলিমের চিন্তার বিষয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر»

“বহু রোযাদার রোযার মাধ্যমে ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কিছুই লাভ করে না এবং রাত্রের বহু নামাযী রাত্রী জাগরণ ছাড়া আর কিছুই পায় না।[12]

চিন্তার বিষয় হলো, রোযার এতো অগণিত পুরস্কার ও মর্যাদা সত্ত্বেও বহু রোযাদার এবং তারাবী ও তাহাজ্জুদ গুজারের ভাগ্যে ক্ষুধা-পিপাসা এবং রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছু জোটে না। রমযান মাসে আল্লাহর সকল মাখলুক আল্লাহর রহমতের স্পর্শ লাভ করে, সেখানে বহু রোযাদারের এই দুরবস্থা কেন? এর কারণ ও প্রতিকার জানা না থাকলে আমরাও সেই দুর্ভাগ্যের মিছিলের অংশীদার হয়ে যেতে পারি। মোটেও বিচিত্র নয় যে, এতদিন আমরা আমাদের রোযার মাধ্যমে ক্ষুধা-পিপাসা ও রাত্রি জাগরণের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারিনি।

তাই রমযানের রোযা সম্পর্কে আজ আমাদেরকে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসমালোচনা করতে হবে। আসলে রোযা বলতে শুধু সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগ হতে বিরত থাকা নয়, বরং রোযাদারকে অবশ্যই তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও রোযার আওতায় আনতে হবে। তাহলে আমরা আমাদের রোযাকে সফল করে তুলতে পারবো ইনশাল্লাহ। আর এক্ষেত্রে অন্তর,পেট,জিহ্বা ,কান প্রভৃতিরও রোযা থাকা আবশ্যক।

ক. অন্তরের রোযা

দেহের রোযার ভিত্তি হচ্ছে অন্তরের রোযা। শুধু তাই নয়, যে কোনো ইবাদতে অন্তরের স্থান সবার আগে। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ ١١ ﴾ [التغابن: ١١ ﴿

“যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়াত করেন।”

অন্তরের হেদায়াত সকল ইবাদতের মূল কথা। তাই রোযার জন্য মন-মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা এবং প্রবৃত্তিকে পবিত্র ও কলুষমুক্ত হতে হবে। সৎ নিয়ত, সৎ চিন্তা, পরিকল্পনা, একনিষ্ঠতা কিংবা এখলাস হচ্ছে অন্তরের মূল কথা। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إنما الأعمال بالنيات»

“সকল আমলের মূল ভিত্তি হচ্ছে নিয়ত।”[13]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন:

«أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ»

“হুশিয়ার! শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোশত এমন আছে যা ঠিক ও সংশোধিত হলে, গোটা শরীর ঠিক ও সংশোধিত থাকে এবং তা খারাপ হলে গোটা শরীর খারাপ হয়ে যায়। হুশিয়ার! সেটি হচ্ছে অন্তর।[14]

মন বা অন্তর দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের অন্তর হচ্ছে, ঈমানের রসে সিক্ত ও আল্লাহ ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ। তা দ্বীন ও ঈমানের প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহর প্রতি সকল ত্যাগ তিতিক্ষার জন্য নিবেদিত। সেই মন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ নিষেধ মানার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে এবং বাতিল ও অনইসলামী কাজের প্রতি তার থাকে প্রচন্ড ঘৃণা ও বিদ্রোহের মনোভাব। আরেক ধরনের অন্তর হচ্ছে, মৃত ও অসুস্থ্য। তাকে পাপী অন্তরও বলা যায়। এই অন্তরের প্রধান কাজ হলো, দ্বীন ও ঈমান এবং নেক কাজে অনীহা, অনাগ্রহ ও ইসলাম বিরোধী কাজে উৎসাহবোধ করা। শেষোক্ত ধরনের অন্তর সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

[﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ﴾ [البقرة: ١٠

‘তাদের অন্তরে রয়েছে রোগ এবং আল্লাহ সে রোগ আরো বাড়িয়ে দেন” [সূরা আল বাকারা:১০]

[﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ ٢٤﴾ [محمد: ٢٤

“তারা কি কুরআনকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তরে তালা লাগানো” (সূরা মোহাম্মদ: ২৪)

সে জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি করে নিম্নের এই দো‘আ পড়তেন।

«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»

“হে অন্তর পরিবর্তনকারী। আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দাও।”[15]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অন্তরের রোযা বলতে কি বুঝায়? অন্তরের রোযা বলতে বুঝায় অন্তরকে শির্ক থেকে মুক্ত, বাতিল আকীদা বিশ্বাস থেকে দূরে এবং খারাপ ও নিকৃষ্ট ওসওয়াসা মনোভাব ও নিয়ত থেকে খালি রাখা। মনকে গর্ব অহংকার থেকে দূরে, হিংসা-বিদ্বেষ ও লোক দেখানোর মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত রাখা। কেননা, তা নেক আমলকে ধ্বংস করে ও জ্বালিয়ে দেয়। তখন গুনাহের কাজের প্রতি কোনো আগ্রহ উদ্দীপনা থাকবে না।

মনকে এ সকল খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখলেই অন্তরের রোযা হয়ে যায়। তখন রোযাদারের মন আল্লাহর ভালোবাসা পূর্ণ থাকে এবং তাকে তাঁর নাম ও গুণাবলীসহ স্মরণ করতে থাকে। অন্তর সর্বদা আল্লাহর সৃষ্ট জগত ও বিচিত্র কুদরত সম্পর্কে ধ্যানে থাকে এবং মন্দ ও খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে।

মুমিনের অন্তরে ঈমানের রোশনী বা আলো থাকে। এর সাথে অন্ধকার সহ-অবস্থান করতে পারে না। ঈমানী নূর বা আলো বলতে বুঝায়, চিরন্তন পয়গাম, আসমানী শিক্ষা ও আল্লাহর আইনের আলোকবর্তিকা। ঐ নূরের সাথে আল্লাহর তৈরি ফিতরাত বা স্বভাব-প্রকৃতির নূরও যোগ হয়। তখন দুই নূর এক সাথে হয়- এ কথাই মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿نُّورٌ عَلَىٰ نُورٖۚ يَهۡدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُۚ﴾ [النور: ٣٥]

‘নূরের উপরে নূর, আল্লাহ যাকে চান তাকে নিজ নূরের দিকে হেদায়াত দান করেন।’ (সূরা নূর: ৩৫)

অন্তর রোযা রাখলে তা আল্লাহর ভালোবাসায় আবাদ হয়। তখন তা বাতির মতো মিটমিট করে জ্বলতে শুরু করে। দিনে তা সূর্যের মতো আলো দান করে এবং ভোর রাতে সোবহে সাদিকের লালিমার মতো জ্বলতে থাকে। অন্তরকে হিংসা বিদ্বেষ, ঘৃণা ও ধোঁকাবাজি থেকে দূরে রাখতে পারলে জান্নাতে প্রবেশের রাস্তা প্রশস্ত হবে। অন্তরের রোযার এটাও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। আল্লাহ রোযার মাধ্যমে আমাদের অন্তরকে পূত পবিত্র ও নিষ্কলুষ করুন।

খ. পেটের রোযা

পেটের রোযা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর উপর দেহের রোযার বিশুদ্ধতা নির্ভর করে। মানুষের জীবন, কাজ-কর্ম, চরিত্র ও আচরণের উপর হালাল ও হারাম খাদ্যের প্রভাব পড়ে। তাই হালাল খাবার খেলে ভাল ও নেক কাজ করার প্রেরণা জাগে। পক্ষান্তরে হারাম খাবার খেলে গুনাহ ও নিষিদ্ধ কাজ করার প্রেরণা জাগে। সে জন্য হালাল খাদ্য গ্রহণের জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ﴾ [المؤمنون: ٥١]

‘হে রাসূলেরা! তোমরা পবিত্র জিনিস থেকে খাবার গ্রহণ কর এবং নেক কাজ কর।’

এখানে পবিত্র খাবারের সাথে নেক আমলকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র ও হালাল খাবারের অনিবার্য দাবী হচ্ছে নেক কাজ করা। (সূরা আল-মোমিনুন: ৫১)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢ ﴾ [البقرة: ١٧٢]

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার প্রদত্ত পবিত্র রিযিক খাও এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।’ (সূরা আল বাকারা: ১৭২)

আল্লাহ পবিত্র জিনিসকে হালাল ও অপবিত্র জিনিসকে হারাম করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ١٥٧ ﴾ [الاعراف: ١٥٧]

‘আল্লাহ পবিত্র জিনিসসমূহকে হালাল ও অপবিত্র জিনিসসমূহকে হারাম করেছেন।’ (সূরা আ‘রাফ: ১৫৭)

পেটের রোযা বলতে বুঝায় পেটকে হারাম খাদ্য ও পানীয় থেকে বাঁচানো। ভুঁড়িভোজ বা অতিরিক্ত আহার না করা, রোযার সময় দিনে পানাহার থেকে বিরত থাকা এবং হারাম জিনিস দিয়ে ইফতার না করা। হারাম খাবার যেমন:

আল্লাহ অনেক খাবার হারাম ঘোষণা করেছেন। যেমন- শুকরের গোশত, হাতী, কুকুর, বিড়ালসহ বিভিন্ন হিংস্র প্রাণী, চিল, বাজ ও কাকসহ পা দিয়ে ছোঁ মেরে শিকার করা বিভিন্ন পাখী, মদ, মলমূত্রসহ যাবতীয় অপবিত্র জিনিস।

হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থ খাওয়াও হারাম। হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থ অনেক। সেগুলো হচ্ছে:

1. সূদ

মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

‘আল্লাহ বেচা-কেনা ও ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।’ (সূরা আল বাকারা: ২৭৫)

আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠ ﴾ [آل عمران: ١٣٠]

হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। (সূরা আলে ইমরান: ১৩০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ»

আল্লাহ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও স্বাক্ষীগণের উপর লা'নত বর্ষণ করেন।"[16]

যারা ব্যাংক-বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি কাজে সুদী কাজ-কারবার করে তাদের ঐ সকল আয় হারাম। সে আয় খেয়ে রোযা রাখলে, যাকাত দিলে কিংবা হজ্জসহ যাবতীয় নেক কাজ করলে আল্লাহ কবুল করবেন না।

2. ঘুষ

ঘুষের আয় হারাম। এই আয় দিয়ে খাদ্য কিনে খাওয়া, জীবিকা নির্বাহ করা ও পরিবার চালানো হারাম। স্বভাবতই এই অর্থ খরচ করে রোযা রাখলে, সেহরী ও ইফতার খেলে আল্লাহ তা কবুল করবেন না।

ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহণকারী দুইজনই জাহান্নামে যাবে। কেউ কেউ ঘুষকে বকশিশের সমতূল্য মনে করেন এবং ভাবেন যে, তা ঘুষ নয়, আসলে তা ঘুষ।'

3. অন্যায় পথে অর্থ আয় করা

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ ١٨٨ ﴾ [البقرة: ١٨٨]

'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের অর্থ আত্মসাৎ করো না।' (সূরা আল বাকারা: ১৮৮)

অন্যায়ভাবে আয়ের বহু পদ্ধতি ও উপায় আছে। এর মধ্যে রয়েছে মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেওয়া, চুরি-ডাকাতি

করা, জাদু ও মন্ত্র করা, জুয়া, মদ ও হারাম জিনিসের ব্যবসায়ে আয়, ওজনে কম দেওয়া ইত্যাদি।

4. জুলুম

আল্লাহ জুলুম করে অর্থ আয় করতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠ ﴾ [النساء: ١٠]

'যারা জুলুম সহকারে ইয়াতীমের মাল-সম্পদ খায়, তারা মূলতঃ পেটে আগুন প্রবেশ করায় এবং তারা শীঘ্রই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সূরা নিসা: ১০)

সমাজের ধনী ও শক্তিশালী লোকেরা কিংবা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা অনেক সময় জবরদস্তি ও জুলুম করে অপরের অর্থ আত্মসাৎ করে।

হারাম আয়-রোজগার দিয়ে রোযাসহ যত ইবাদত করা হয় সেগুলোর কোনটাই যে আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাদীস রয়েছে। তিনি বলেছেন:

«ثم ذكرَ الرجلَ يُطيل السَّفر ، أشعثَ أغبَرَ ، يمدّ يديه إلى السماء : يا ربِّ يارب ومطْعمه حرام ، ومشْرَبُهُ حرام ، وملبَسَهُ حرام، وغُذِيَ بالحرام ، فأنَّى يُستجَاب لذلك ؟ »

'তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক মুসাফিরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন যিনি বহু দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে এসেছেন এবং যার চুল ধুলা মলিন ও এলোকেশী, তিনি আকাশ পানে দুই হাত তুলে দো'আ করেন এবং বলেন, হে রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং হারামের উপর ভিত্তি করেই তিনি গড়ে উঠেছেন, তার দো'আ কিভাবে কবুল হবে?'[17]

হাদীস দ্বারা বুঝা যায় লোকটি বড় ও বেশী ইবাদতকারী এবং বহু দূর-দূরান্ত থেকে পবিত্রস্থান সফরে এসেছেন দো'আ ও ইবাদতের জন্য। কিন্তু তাতে লাভ হবে কি? যার খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হারাম আয়ের এবং যিনি হারাম খেয়েই নিজের শরীরের রক্ত-মাংস তৈরি করেছেন তার ইবাদত অবশ্যই আল্লাহ কবুল করবেন না। তাই এর রোযা ব্যর্থ।

তাই হালাল কামাই-রোজগার ও হালাল খাদ্য খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»

'নিজ হাতের কামাই-রোজগারের চাইতে বান্দার উত্তম খাবার আর কিছু নেই। স্বয়ং আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজ হাতের আয় থেকে খেয়েছেন।[18]

বিভিন্ন নবী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। নূহ (আ) কাঠমিস্ত্রি, মূসা (আ) রাখাল, দাউদ (আ) কামার, সোলাইমান (আ) রাজমিস্ত্রি, যাকারিয়া (আ) কাঠমিস্ত্রি এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখাল ও ব্যবসায়ী ছিলেন।

ইসলাম একদিকে ব্যক্তি জীবনে যেমন হালাল আয়ের নির্দেশ দিয়েছে, তেমনি সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনেও হালাল আয়-রোজগারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। ইসলাম সুদ, ঘুষ, জুয়া হারাম জিনিসের ব্যবসা-বাণিজ্য, চোরাকারবারী, মজুতদারী, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল মেশানো, চুরি-ডাকাতি, জুলুম-নির্যাতন ও ছিনতাই-রাহাজানির মাধ্যমে অর্জিত আয়কে হারাম ঘোষণা করেছে। তাই একজন রোযাদারকে ব্যক্তিগত আয়-রোজগার হালাল করার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকেও ইসলাম সম্মত করার চেষ্টা করতে হবে। রাষ্ট্র থেকে সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া ও অন্যান্য আয়ের সকল উৎস বন্ধ করে দিতে হবে। তা না হলে সেগুলোর হারাম প্রভাবও ব্যক্তি জীবন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত কাপড়ের কলের তৈরি কাপড় পরে আমরা নামাজ-রোযা ও দো'আ করছি। সুদের ময়লাযুক্ত ঐ সকল কাপড় পরে ইবাদত কিংবা দো'আ করলে কতটুকু কবুল হবে তা চিন্তার বিষয়। তাই প্রয়োজন হচ্ছে দেশে ইসলামী অর্থনীতি চালু করা, যার ফলে ব্যক্তিগত আয়কে হালাল করা অধিকতর সহজ হবে।

গ. জিহ্বার রোযা

ইসলামে মুখের কথার গুরুত্ব অনেক বেশী। জিহবা হচ্ছে কথা বলার বাহন বা হাতিয়ার। তাই জিহবাকে সংযত করা প্রয়োজন। বিশেষ করে রোযার ক্ষেত্রে এই সংযম আরো বেশী দরকার।

আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেছেন:

[مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ ١٨] [ق: ١٨]

'কোন কথা উচ্চারণ করার সাথে সাথে অপেক্ষমান পর্যবেক্ষক প্রস্তুত থাকে।' (সূরা ক্বাফ: ১৮)

অর্থাৎ মানুষের উচ্চারিত সকল শব্দের তদারক করা হয় এবং সেজন্য হিসেব দিতে হবে। তাই কথা বলার সময় বিবেচনা করতে হবে ও ভালো কথা ছাড়া খারাপ কথা বলা যাবে না।

কুরআনে অপ্রয়োজনীয় কথা পরিহার করাকে মোমিনের বিশেষ গুণ আখ্যায়িত করে আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ ٣﴾ [المؤمنون: ٣]

‘(তারাই মুমিন) যারা অপ্রয়োজনীয় ও বেহুদা কথা থেকে বিরত থাকে। (সূরা আল-মুমিনুন: ৩)

সাহাল ইবন মু‘আয থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة»

‘যে আমাকে তার দুই ঠোঁট ও দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থানের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার জান্নাতের নিশ্চয়তা দেবো।’[19]

এই হাদীসে জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই দুই স্থানকে হেফাজত করলে জান্নাত পাওয়া যায়।

মূলতঃ এই দুটো জিনিস খুবই বিপজ্জনক এবং শয়তানের বড় হাতিয়ার। জিহ্বার কারণেই মানুষ কষ্ট পায়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«المسلم من سلم المسلون من لسانه ويده»

‘সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম যার জিহবা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।’[20]

পক্ষান্তরে যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ নয়, সে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম নয়।’ প্রবাদ আছে, ‘কথার ঘা শুকায় না, মারের ঘা শুকায়।’ তাই জিহবার ব্যাপারে সর্বাধিক সতর্ক থাকতে হবে।

কথা কম বললে ভুল কম হবে এবং অপরাধ বাড়বে না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন কথা বললে ভাল কথা বলে কিংবা চুপ করে থাকে।[21]

এই হাদীসের মর্মানুযায়ী ভাল কথাই বলা উচিৎ। আর ভাল কথা না থাকলে চুপ করে থাকা উচিৎ।

জিহবার ১৫টিরও বেশী দোষ আছে। সেগুলো জিহবা ছাড়া সংগঠিত হতে পারে না। সেগুলো হচ্ছে:
১. মিথ্যা বলা
২. খারাপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা
৩. অশ্লীল ও খারাপ কথা বলা
৪. গালি দেওয়া
৫. নিন্দা করা
৬. অপবাদ দেওয়া
৭. চোগলখুরী করা
৮. বিনা প্রয়োজনে গোপনীয়তা ফাঁস করে দেওয়া
৯. মোনাফেকী করা ও দুই মুখে কথা বলা
১০. ঝগড়া-ঝাটি করা
১১. হিংসা করা
১২. বেহুদা ও অতিরিক্ত কথা বলা
১৩. বাতিল ও হারাম জিনিস নিয়ে আলোচনা করে আনন্দ লাভ করা
১৪. অভিশাপ দেওয়া
১৫. সামনা-সামনি প্রশংসা করা।

মুমিনদেরকে সাধারণভাবে এবং রোযাদার মুমিনকে বিশেষভাবে জিহবার এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে দূরে থাকতে হবে। তাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه»

'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ ত্যাগ করে না, তার খানাপিনা বন্ধ রাখতে আল্লাহর কোনো প্রয়োজনে নেই।'[22]
অর্থাৎ আল্লাহ এই জাতীয় রোযা কবুল করবেন না এবং সওয়াব দেবেন না। অতএব কেবল খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকার নামই রোযা নয়, বরং রোযা হচ্ছে, বেহুদা কথা ও গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকা।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাকে জিহবার অনিষ্ট থেকে বিশুদ্ধ রাখার পদ্ধতি বাতলিয়ে দিয়েছেন:

«إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وفي رواية: ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم مرتين»

'তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন গুনাহ, অজ্ঞতা ও জাহেলি কাজ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয়

কিংবা তার সাথে লড়তে আসে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযা রেখেছি, আমি রোযাদার।'[23]

হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতিই জিহবার অপরাধ থেকে বাঁচার উত্তম মাপকাঠি। অর্থাৎ কেউ তাকে খারাপ কাজে জড়াতে চাইলে সে জড়িয়ে যাবে না; বরং এড়িয়ে যাবে। যে ব্যক্তি জিহবার লাগাম খুলে দেয় তার রোযা কিভাবে হয়? যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মিথ্যা বলে ও কথার মাধ্যমে ধোঁকা দেয় ও অন্যকে কষ্ট দেয়, তার রোযার ফলাফল কি হবে? এ সকল রোযা কিভাবে কবুল হতে পারে?

কত লোক আছে জিহবার অনিষ্টতার কারণে তাদের সকল রোযা নষ্ট বা হাল্কা করে ফেলে। রোযার উদ্দেশ্য তো শুধু উপোস থাকা নয়; বরং রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে আদব, শিষ্টাচার ও সংযম শিক্ষা করা এবং তার প্রয়োগ করা। তাই রোযাদারের মুখ সর্বদা ভাল কথা, কুরআন পাঠ, তওবা, তাসবীহ ও আল্লাহর পথে দাওয়াত দানের কাজে ব্যস্ত থাকবে এবং আল্লাহর রহমতের আদ্রতায় ভিজা থাকবে।

ঘ. কানের রোযা

কান শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কানের মাধ্যমে বাইরের উদ্দীপক ভেতরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, নবজাত ভূমিষ্ঠ শিশু প্রথমে কানে শুনে। চোখ থাকা সত্ত্বেও সে কিছু দেখতে পায় না। অবশ্য ২/১ দিন পর কিংবা একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর শিশুর চোখে দেখার কাজ শুরু হয়। সম্ভবতঃ কুরআন নিম্নোক্ত আয়াতে চোখের আগে কানের উল্লেখ করে এই সৃষ্টি রহস্য এবং কানের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗا ٣٦﴾ [الاسراء: ٣٦]

'নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।' (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৬)

তাই কানের রোযার গুরুত্ব অপরিসীম। কান যা শুনে সে জন্য তাকে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। কান দিয়ে ভাল জিনিস শুনতে হবে এবং খারাপ জিনিস থেকে কানকে দূরে রাখতে হবে।

কানের রোযা বলতে বুঝায় বাজে গান-বাজনা না শুনা এবং মন্দ, খারাপ ও অশ্লীল কথা যেন কানে প্রবেশ না করে সে জন্য চেষ্টা করা। নেক লোকেরা ভাল কথা ভালভাবে শুনেন এবং খারাপ কথা কিংবা আল্লাহর অসন্তোষজনক কথা তারা শুনেন না। কেউ যদি গুনাহ ও পাপের কথা কানে প্রবেশ করায় তাহলে তা তার অন্তরে ঘর, সদিচ্ছার প্রাসাদ ও জ্ঞানের বাগানকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ নেক লোকদের কানের একটি সৎ গুণ সম্পর্কে কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন:

﴿وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا ٧٢﴾ [الفرقان: ٧١]

“তারা যখন অতিক্রম করে তখন ভদ্রভাবে অতিক্রম করে।” অর্থাৎ তারা খারাপ কথা ও অশ্লীল বাক্য না শুনে ভদ্রভাবে চলে যায়। (সূরা ফোরকান-৭১)

আল্লাহ এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন:

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغۡوَ أَعۡرَضُواْ عَنۡهُ ٥٥ ﴾ [القصص: ٥٥]

“তারা যখন বেহুদা কথা শোনে তখন তারা তা এড়িয়ে যায়। (সূরা আল-কিসাস-৫৫)

অপরদিকে, যারা পাপী ও গুনাহগার তারা মন্দ ও অশ্লীল কথা,গালি, গান-বাজনাসহ নিষিদ্ধ বিষয়গুলো শোনে এবং আল্লাহ প্রদত্ত শ্রবণ শক্তিকে নষ্ট করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَقَدۡ ذَرَأۡنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ لَهُمۡ قُلُوبٞ لَّا يَفۡقَهُونَ بِهَا وَلَهُمۡ أَعۡيُنٞ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا وَلَهُمۡ ءَاذَانٞ لَّا يَسۡمَعُونَ بِهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡغَٰفِلُونَ ١٧٩ ﴾ [الاعراف: ١٧٩]

“আমরা জাহান্নামের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ তৈরী করেছি যাদের অন্তর আছে কিন্তু বুঝে না, চোখ আছে দেখে না এবং কান আছে, শুনে না। তারা হচ্ছে পশু কিংবা এর চাইতেও নিকৃষ্ট। তারা হচ্ছে উদাসীন।” (সূরা আল আ‘রাফ-১৭৯)

এই আয়াতে কান, চোখ ও অন্তরের নষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে, রোযার মাধ্যমেই কেবলমাত্র এগুলো ঠিক রাখা যায়। একজন মুমিন মুসলিম রোযা রেখে কুরআন শুনবে এবং ঈমান, হেদায়াত ও কল্যাণের বাণী শিখবে। কুরআন শুনে অন্তরে প্রশান্তি নাযিল হয় এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচা যায়। কানের খাদ্য হলো, আল্লাহর যিকির, উপকারী জ্ঞান, ভাল ওয়াজ নসীয়ত, সুন্দর কথা, ইসলামী কবিতা ইত্যাদি শুনার মাধ্যমে কানের সঠিক রোযা রাখা সম্ভব।

রমযানের মূল শিক্ষাসমূহ

ক. তাকওয়া

তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হল, বেঁচে থাকা, ভয় করা।

পারিভাষিক অর্থ হলো- "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সকল আদেশ মানা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকা।[24] অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করতে হবে, তাঁর আদেশ নিষেধ মানতে হবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। সকল ফরয, ওয়াজিব পালন করে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে তাকওয়া।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: 'তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা, তাঁর নাফরমানী না করা; আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁকে ভুলে না যাওয়া এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ও তাঁর কুফরী না করা।[25]

ওমর ইবন আবদুল আযীয (র.) বলেছেন: 'দিনে রোযা রাখা কিংবা রাত্রে জাগরণ করা অথবা দুটোর আংশিক আমলের নাম তাকওয়া নয়। বরং তাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহ যা ফরয করেছেন তা পালন করা এবং তিনি যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা। এরপর আল্লাহ যাকে কল্যাণ দান করেন সেটা এক কল্যাণের সাথে অন্য কল্যাণের সম্মিলন।[26]

ইবনুল কাইয়েম (রহ.) বলেন: তাকওয়ার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আর যত কিছু বলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এটাই সর্বোত্তম সংজ্ঞা। আল্লামা যাহাবী বলেছেন, এটা তাকওয়ার চমৎকার ও সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা। শাইখ নাসেরুদ্দিন আলবানী বলেছেন: এ বর্ণনা ত্বলক ইবন হাবীবের সংজ্ঞা থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ।

প্রখ্যাত তাবে'ঈ ত্বলক ইবন হাবীব (রহ.) বলেছেন: 'আল্লাহর প্রতি তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর আলোর রৌশনীতে তাঁর হুকুমের আনুগত্য করা ও সওয়াবের আশা করা এবং আল্লাহর আলোর রৌশনীতে তাঁর শাস্তিকে ভয় করে তাঁর নাফরমানী ত্যাগ করা।[27]

তাকওয়া হচ্ছে একজন মুমিনের কাম্য গুণ। এই গুণ না থাকলে মুমিন হওয়ার কোনো অর্থ নেই। কারণ, যে মুমিন আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মানে না সে আল্লাহকে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে না। ভয় করলে, অবশ্যই সে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানতো। তাকওয়া অর্জনের জন্য কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান দরকার। সেজন্য কুরআন ও হাদীস পড়তে হবে ও বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যারা কুরআন-হাদীস পড়ে না তাদের পক্ষে তাকওয়া অর্জন করা খুবই কষ্টকর।

তাকওয়ার ব্যাপারে অনেক ভুল বোঝাবুঝি আছে। কিছু লোক আছে যারা ইসলামের ফরয, ওয়াজিব ও হারাম সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল নন, তারা বিশেষ কিছু সুন্নত ও নফল কাজ করে নিজেদেরকে মোত্তাকী এবং অন্যদেরকে মোত্তাকী নয় বলে মনে করেন। তারা হাতে তসবীহ, মাথায় টুপি-পাগড়ী, গায়ে লম্বা জামা এবং পেশাব-পায়খানায় ঢিলা ব্যবহার করাকে তাকওয়ার মাপকাঠি মনে করেন। অথচ এগুলো সুন্নত ও

মোস্তাহাবের বেশী কিছু নয়। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের অগণিত ফরয-ওয়াজিব রয়েছে যেগুলো তারা পালন করেননা এবং সেগুলোর খবরও রাখেন না। যেমন পর্দাহীনতা, সুদ, ঘুষ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ, দাওয়াতে দ্বীন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ইত্যাদি পালনের ব্যাপারে তারা উদাসীন।

পক্ষান্তরে, যারা এসব কাজ করেন এবং সেজন্য জান-মাল উৎসর্গ করেন তাদেরকে তারা মোত্তাকী বলতে নারাজ। অথচ তারাই সত্যিকার অর্থে মুত্তাকী। তারাই রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতিতে জান-মালের সর্বাত্মক কোরবানী করে তাকওয়া চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখান। তারা বিজয়ী গাজী কিংবা শহীদ হন। এরাই যদি মোত্তাকী না হন, তাহলে যারা এতো সস্তা আমল করে এবং কঠিন আমল থেকে দূরে থাকে তারা মোত্তাকী হন কোনো যুক্তিতে? তাকওয়াতো শুধু কিছু সুন্নাত ও সীমিত ফরয কাজ আদায়ের নাম নয়। মুত্তাকী হতে হলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক নীতিসহ শিক্ষা ও অন্যান্য সকল বিষয়ে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মানতে হবে।

এক ধরনের ভণ্ড পীর-ফকির ও দরবেশ আছে যারা বহু অনৈসলামী কাজ করে নিজেদেরকে মুত্তাকী এবং আল্লাহর ওলী বলে প্রকাশ করে। তাদের হাতে তাসবীহ ও লাঠি, মুখে গাজা এবং পরনে বিভিন্ন ধরনের কাপড় থাকে। কবর পূজা তাদের প্রধান কাজ। এগুলো তাকওয়াতো দূরের কথা; বরং তার থেকে হাজার মাইল দূরের জিনিস। কেননা, তাকওয়ার অর্থ হল, সকল ফরয-ওয়াজিব মানা এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে, তারা হারাম কাগুলো সব করে এবং ফরয-ওয়াজিব থেকে দূরে থাকে। এরা জাহান্নামের ইন্ধন ছাড়া আর কি?

ওমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর সময় নিজ পুত্র আব্দুল্লাহকে অসীয়ত করেন, তুমি তাকওয়া অর্জন করো, যে তাকওয়া অর্জন করলে আল্লাহ তোমাকে বাঁচাবেন, যে আল্লাহকে ঋণ দেবে (দান করবে) তিনি তাকে বিনিময় দেবেন, যে তাঁর শুকরিয়া আদায় করবে, আল্লাহ তাকে বাড়িয়ে দেবেন।

‘ওমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবনে কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উবাই ইবনে কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আপনি কি কাঁটাযুক্ত পথে চলেছেন? ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হ্যাঁ। উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কিভাবে চলেছেন? ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, গায়ে যেন কাঁটা না লাগে সে জন্য চেষ্টা করেছি ও সতর্কভাবে চলেছি। উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘এটাই হচ্ছে তাকওয়ার উদাহরণ।’[28]

ফলে দেখা যাচ্ছে, উবাই ইবনে কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে, তাকওয়ার উদাহরন হচ্ছে, কণ্টকাকীর্ণ সরু গিরিপথে চলা। যার দুই দিকেই কাঁটা এবং যে পথে সামনে চলতে হলে সাবধানে না চললে গায়ে কাঁটা লাগার সম্ভাবনা আছে। সমাজে হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ ও শয়তানের ওয়াসওয়াসাকে কাঁটার সাথে তুলনা করা যায়। আর সামনে অগ্রসর হওয়াকে তাকওয়া বলা হয়। কাঁটার মাঝে চলতে হলে কাঁটা সরিয়ে চলতে হবে।

তাহলে কাঁটাবিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। মুমিনকেও অনুরূপভাবে কাঁটা সরিয়ে নিষ্কণ্টক পথে চলতে হবে। তাহলে তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে মুত্তাকী হওয়া যায়।

বাইম মাছ যেমন কাদার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তার গায়ে কাদা লাগে না, একজন মুমিনও সমাজে পাপ-পঙ্কিলতা এবং আল্লাহর নাফরমানীর কলুষিত পরিবেশে বাস করা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন। পরিবেশের তালে গা ভাসিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে কলুষমুক্ত থাকেন। তিনি স্রোতের বিপরীতে চলে এবং সমাজে ন্যায় ও কল্যাণের স্রোতধারা প্রবাহিত করেন।

সাওম ফরয করার আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: ‘সম্ভবত তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।’ এখানে ‘সম্ভবতঃ’ শব্দটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া। কিন্তু রোযা রাখলেই সবাই তাকওয়া অর্জন করতে পারে না। অনেক রোযাদারের রোযা, রাত্রি জাগরণ এবং ক্ষুধা-পিপাসার কষ্ট ছাড়া অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারে না যদিও তারা রোযা রেখেছে। এর কারণ কি? কারণ হচ্ছে, তারা না তাকওয়ার অর্থ বুঝেন, আর না বুঝেন রমযানের উদ্দেশ্য। বুঝেন না বলেই রোযা শেষ হওয়ার পর কিংবা রমযানের মধ্যেই তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন এবং নিষিদ্ধ কাজ করে থাকেন। রোযা তাদের জীবনকে বিশুদ্ধ বা সংশোধিত করতে পারেনি। রোযার মাধ্যমে তাদের জীবন এবং আমলের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই তারা রোযার আকাংখিত ফল লাভ করতে সক্ষম হননি। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন: ‘সম্ভবত তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।’ অর্থাৎ তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা থাকলে তা অর্জন করা সম্ভব। যাদের চেষ্টা নেই, তারা তা অর্জন করতে পারে না।

অন্যদিকে, যারা রোযার মাধ্যমে নিজেদের জীবন ও আমলের পরিবর্তন এনেছেন এবং রোযার আগে যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করতেন, তারা রোযার মাধ্যমে এবং রোযার পর আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করা শুরু করেছেন, তারাই রমযানের মূল উদ্দেশ্য ‘তাকওয়া’ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের জন্যই রয়েছে রমযানের অনেক পুরস্কার। হাদীসে রোযাদারের জন্য যে সকল ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে, তারাই তা লাভ করবেন।

বস্তুত তাকওয়া আগের ও পরের সবার জন্য আল্লাহর অচিয়ত। আল্লাহ সকল যুগের লোকদেরকে তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَقَدۡ وَصَّيۡنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَإِيَّاكُمۡ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ ﴾ [النساء: ١٣١]

‘আমি তোমাদের পূর্বের আহলে কিতাবদের এই উপদেশ দিয়েছিলাম আর এখন তোমাদেরকেও উপদেশ দিচ্ছি যে তাকওয়া অবলম্বন করো।’ (সূরা নিসা: ১৩১)

তাকওয়া অবলম্বন করলে দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক ফায়দা আছে। এখন আমরা সে সকল ফায়দা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

• তাকওয়ার দুনিয়াবী ফায়দা

1. তাকওয়ার ফলে মানুষের জটিল বিষয়গুলো সহজ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন:

[وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤ ﴾ [الطلاق: ٤ ﴿

‘আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ বান্দার বিভিন্ন বিষয়গুলো সহজ করে দেবেন।’ (সূরা তালাক: ৪) এর ফলে সঠিক পথে চলতে বান্দার কোনো কষ্ট হবে না।

2. তাকওয়ার ফলে মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ إِذَا مَسَّهُمۡ طَٰٓئِفٞ مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبۡصِرُونَ ٢٠١ ﴾ ﴿
[[الاعراف: ٢٠١

‘যারা তাকওয়া অনুসরণ করে, শয়তান তাদেরকে ক্ষতি করার জন্য স্পর্শ করলে তারা সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন তারা তাদের জন্য সঠিক ও কল্যাণকর পথ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়।’ (সূরা আরাফ: ২০১)

3. শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচা বিরাট সাফল্য। তাকওয়ার মাধ্যমে আসমান ও যমীনের বরকতের দরজা খুলে যায়। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ ﴿
[وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ٩٦ ﴾ [الاعراف: ٩٦

‘জনপদবাসীরা ঈমান ও তাকওয়ার অনুসরণ করলে, আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দেবো।’ (সূরা আরাফ: ৯৬)
ফলে বান্দার আর সমস্যা থাকবে না।

4. সত্য ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার তৌফিক লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন:

[يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانٗا ٢٩ ﴾ [الانفال: ٢٩ ﴿

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার মানদণ্ড দান করবেন।' (সূরা আনফাল- ২৯)

5. সংকট থেকে উদ্ধার এবং অভাবিত রিযক দান করবেন। তিনি বলেন:

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ ٣﴾ [الطلاق: ٢، ٣]

'যে আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অনুসরণ করে, আল্লাহ তাকে সংকট থেকে উদ্ধার করবেন এবং তাকে অভাবিত রিযক দান করবেন।'(সূরা তালাক: ২০)

বিপদ মুক্তি ও প্রশস্ত রিযক বিরাট নেয়ামত।

6. আল্লাহর ওলী ও বন্ধু হওয়া যায়। তিনি বলেন:

﴿إِنۡ أَوۡلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُتَّقُونَ ٣٤﴾ [الانفال: ٣٤]

'মুত্তাকীরা তাঁর বন্ধু।' (সূরা আনফাল: ৩৪)
যার বন্ধু আল্লাহ, তার আর সমস্যা কি?

7. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧٦﴾ [ال عمران: ٧٦]

'আর নিশ্চয় আল্লাহ মোত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান: ৭৬)

এটা তাকওয়ার মহান সাফল্য।

8. আল্লাহর সাহচার্য লাভ করা যায়। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ١٩٤﴾ [البقرة: ١٩٤]

'যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর সীমা লংঘন থেকে দূরে থাকে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেইসব মুত্তাকীদের সাথে আছেন।' (সূরা আল বাকারা: ১৯৪)

আল্লাহু আকবার, আল্লাহর সাহায্য, হেফাজত ও নিরাপত্তা লাভ করা কত বিরাট সৌভাগ্য!

9. মুত্তাকীর আমল কবুল হয়। তিনি বলেন:

﴿ [إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧] ﴾ [المائدة: ٢٧]

'আল্লাহ অবশ্যই মোত্তাকীদের আমল কবুল করেন।' (সূরা আল মায়েদা: ৫৭)

আমল কবুল না হলে সর্বনাশ। কিন্তু মোত্তাকীর এটা সৌভাগ্য।

10. দুনিয়া ও আখিরাতের আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কোনো ভয়-ভীতি নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ [فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٣٥] ﴾ [الاعراف: ٣٥]

'যারা তাকওয়া অর্জন করে ও নিজের আচার-আচরণকে সংশোধন করে, তাদের কোনো ভয়-ভীতি ও পেরেশানী নেই।' (সূরা আরাফ: ৩৫)

11. গুণাহ মাফ ও বিশাল পুরষ্কার দেওয়া হবে। তিনি বলেন:

﴿ [وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ٥] ﴾ [الطلاق: ٥]

'যে আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অনুসরণ করে, আল্লাহ তার গুণাহ মোচন করবেন এবং তাকে মহা পুরষ্কার দেবেন।' (সূরা তালাক: ৫)

12. তাকওয়া উত্তম সম্বল। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ [وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ] ﴾ [البقرة: ١٩٧]

'তোমরা সম্বল সংগ্রহ কর। তবে তাকওয়াই হলো উত্তম সম্বল।' (সূরা আল বাকারা: ১৯৭)

13. মুত্তাকী আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ [إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ ١٣] ﴾ [الحجرات: ١٣]

'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত যে অধিকতর তাকওয়ার অনুসারী।' (সূরা আল হুজুরাত: ১৩)
মুমিনের এর চাইতে বড় চাওয়া-পাওয়া আর কি হতে পারে?

14. আল্লাহ মোমেন মুত্তাকীকে নাজাত দেন ও উদ্ধার করেন। তিনি বলেন:

﴿ وَنَجَّيۡنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١٨ ﴾ [فصلت: ١٨]

'যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অনুসরণ করেছে আমরা তাদেরকে উদ্ধার করেছি ও বিপদমুক্ত করেছি।' (সূরা ফুচ্ছিলাত: ১৮)

15. তাকওয়ার অনুসারীরা দুনিয়া ও আখিরাতের খোশ খবর লাভ করে। এর মধ্যে দুনিয়ায় স্বপ্ন কিংবা মানুষের ভালোবাসা ও প্রশংসা অন্যতম। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ ٦٤ ﴾ [يونس: ٦٣، ٦٤]

'যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে সুসংবাদ।' (সূরা ইউনুস: ৬৩-৬৪)

• তাকওয়ার পরকালীন ফায়দা

তাকওয়ার মাধ্যমে পরকালে জান্নাত, মুক্তি, সম্মান, মর্যাদা ও বহু নেয়ামত লাভের সৌভাগ্য হবে। এখন আমরা এ বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহর বাণী ও প্রতিশ্রুতিগুলো উল্লেখ করবো।

1. মুত্তাকীরা জান্নাতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ ٤٥ ﴾ [الحجر: ٤٥]

'নিশ্চয়ই মোত্তাকীরা জান্নাত ও ঝর্ণাধারার মধ্যে বাস করবে।' (সূরা দোখান: ৫১)

2. তাকওয়ার ফল হবে জান্নাত লাভ। তিনি বলেন:

﴿ وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣ ﴾ [ال عمران: ١٣٣]

'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুতগামী হও, যার প্রশস্ততা হলো আসমান-যমীনের সমান; এটা মোত্তাকীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।' (সূরা আলে ইমরান: ১৩৩)

3. মুত্তাকীরা নহর প্রবাহিত জান্নাতে বাস করবে। তিনি বলেন:

﴿لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ١٥﴾ [ال عمران: ١٥]

‘যারা তাকওয়ার অনুসরণ করে তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে জান্নাত- যার পাশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে।’ (সূরা আলে ইমরান: ১৫)

4. মুত্তাকীদেরকে দলে দলে জান্নাতে নেয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ زُمَرًاۖ ٧٣﴾ [الزمر: ٧٣]

‘যারা তাদের পালনকর্তার ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।’ (সূরা আয-যুমার: ৭৩)

দলে দলে মিছিলের মতো জান্নাতে যাওয়ার আলাদা আনন্দ রয়েছে।

5. মুত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে বাস করবে। সেখানে কোনো বিপদ-আপদ নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٖ ٥١﴾ [الدخان: ٥١]

‘নিশ্চয়ই মোত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করবে।’ (সূরা দুখান: ৫১)

6. মুত্তাকীরা আল্লাহর প্রতিনিধি দলের মর্যাদা লাভ করবে। তিনি বলেন:

﴿يَوۡمَ نَحۡشُرُ ٱلۡمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحۡمَٰنِ وَفۡدٗا ٨٥﴾ [مريم: ٨٥]

‘সেদিন মোত্তাকীদেরকে দয়ালু আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে উঠানো হবে।’ (সূরা মরিয়ম: ৮৫)

7. মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতে কক্ষের উপর কক্ষ অর্থাৎ বহুতল ভবন দেওয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ لَهُمۡ غُرَفٞ مِّن فَوۡقِهَا غُرَفٞ مَّبۡنِيَّةٞ ٢٠﴾ [الزمر: ٢٠]

‘যারা নিজেদের পালনকর্তাকে ভয় করে তাকওয়া অর্জন করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে কক্ষের উপর নির্মিত কক্ষ।’ (সূরা আয-যুমার: ২০)

8. মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে সত্যের আসন। তিনি বলেন:

﴿إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَنَهَرٖ ٥٤ فِي مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَلِيكٖ مُّقۡتَدِرِۭ ٥٥﴾ [القمر: ٥٤، ٥٥]

‘মোত্তাকীরা থাকবে জান্নাত ও নহরে, সত্যের আসনে, সর্বাধিপতি শাহানশাহের সান্নিধ্যে।’ (সূরা আল কামার: ৫৪-৫৫)

9. মুত্তাকীরাই হবে জান্নাতের উত্তরাধিকারী। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿تِلۡكَ ٱلۡجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنۡ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّٗا ٦٣﴾ [مريم: ٦٣]

‘আমার মোত্তাকী লোকদেরকেই আমি জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানাবো।’ (সূরা মরিয়ম: ৬৩)

10. জান্নাতকে মোত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে এবং বিনা কষ্টে তারা তাতে প্রবেশ করবে। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿وَأُزۡلِفَتِ ٱلۡجَنَّةُ لِلۡمُتَّقِينَ غَيۡرَ بَعِيدٍ ٣١﴾ [ق: ٣١]

‘জান্নাতকে মোমেনদের জন্য নিকটবর্তী করা হবে এবং তা দূরে থাকবে না।’ (সূরা কাফ: ৯০)

11. মুত্তাকীদেরকে জান্নাতের আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিয়ে দেবো।’মহান আল্লাহ বলেন,

﴿كَذَٰلِكَ وَزَوَّجۡنَٰهُم بِحُورٍ عِينٖ ٥٤﴾ [الدخان: ٥٤]

“এরূপই এবং আমি তাদেরকে বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের সাথে বিয়ে দিবো” (সূরা দুখান: ৫৪)

12. আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। তিনি বলেন:

﴿ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيّٗا ٧٢﴾ [مريم: ٧٢]

‘আখেরাতে পৌঁছার পর আমি মোত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেবো।’ (সূরা মরিয়ম: ৭২)

13. মুত্তাকীদের বন্ধু ছাড়া কেয়ামতের দিন অন্য সকল বন্ধু শত্রুতে পরিণত হবে। তাই মোত্তাকীদেরকে দুনিয়াতে বন্ধু বানানোর চেষ্টা করলে পরকালে তারা কাজে আসবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ٱلۡأَخِلَّآءُ يَوۡمَئِذِۭ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلۡمُتَّقِينَ ٦٧﴾ [الزخرف: ٦٧]

'মোত্তাকীদের ছাড়া ঐদিন সকল বন্ধু শত্রুতে পরিণত হবে। (সূরা আয-যুখরুফ: ৬৭)

14. মুত্তাকীদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতে পরিষ্কার ও সুপেয় পানি, অবিকৃত স্বাদের দুধ, স্বাদের শরাব এবং স্বচ্ছ মধু এই চার ধরনের নহর প্রবাহিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَۖ فِيهَآ أَنۡهَٰرٞ مِّن مَّآءٍ غَيۡرِ ءَاسِنٖ وَأَنۡهَٰرٞ مِّن لَّبَنٖ لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ خَمۡرٖ لَّذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ عَسَلٖ مُّصَفّٗىۖ وَلَهُمۡ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغۡفِرَةٞ مِّن رَّبِّهِمۡۖ كَمَنۡ هُوَ خَٰلِدٞ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمٗا فَقَطَّعَ أَمۡعَآءَهُمۡ ١٥﴾ [محمد: ١٥]

'মোত্তাকীদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতে আছে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ সুপেয় পানি, অবিকৃত স্বাদের দুধ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাব, পরিষ্কার মধুর নহরসমূহ এবং তাতে আরো আছে সকল ফল-ফলাদি ও তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ক্ষমা।' (সূরা মুহাম্মদ: ১৫)

এ হলো তাকওয়ার কিছু উপকারিতা ও ফায়দা। কুরআন ও হাদীসে তাকওয়ার আরো বহু পুরস্কারের কথা উল্লেখ আছে। তাই সবারই তাকওয়া অর্জনের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিৎ। সেজন্য আল্লাহ বলেছেন:

﴿ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ ١٠٢﴾ [ال عمران: ١٠٢]

'তোমরা আল্লাহকে তাকওয়ার যথার্থ দাবী পূরণ করে ভয় করো।' (সূরা আলে ইমরান- ১০২)

পবিত্র রমযান মাস এ মহান তাকওয়ার অনুশীলনের এক বাস্তব কর্মসূচী। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে রমযানের এ মূল শিক্ষা অর্জনের তওফীক দেন। আমীন!

খ. রমযান তাওবা-এস্তেগফারের মাস

তাওবা শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গুনাহগার বান্দা তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানী থেকে আল্লাহর দিকে পুনরায় ফিরে আসে। বান্দা যত গুনাহই করুক না কেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা ও মাফ করেন। বান্দার গুনাহ যত বড় তাঁর রহমত এর চাইতেও বড়। তাই নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

আল্লাহ পবিত্র কুরআন মাজীদে বলেছেন:

﴿يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣﴾ [الزمر: ٥٣]

“হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই, আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করেন। নিঃসন্দেহে, তিনি অধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা আয যুমার-৫৩)

এ আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া নিষিদ্ধ বা কুফরী।

রমযান মাস হচ্ছে, তাওবা ও ক্ষমার মওসুম-রহমত, নাজাত ও মাগফেরাতের মাস। এ মাস তাওবার জন্য মহামূল্যবান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

“আল্লাহ দিনে গুনাহকারীদের গুনাহ মাফ করার জন্য রাত্রে নিজ ক্ষমার হাত সম্প্রসারিত করেন এবং রাত্রে গুনাহকারীদের গুনাহ মাফ করার জন্য দিনে নিজ ক্ষমার হাত সম্প্রসারিত করেন। কেয়ামতের আগে পশ্চিমে সূর্যোদয় পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে। আল্লাহ বান্দার গুনাহ মাফের জন্য রীতিমত অপেক্ষা করেন। বান্দা মাফ চাইলেই মাফ পেতে পারে।[29]

গুনাহ মাফের জন্য এর চাইতে বড় প্রতিশ্রুতি আর কি হতে পারে? আল্লাহ আরও বলেন:

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَيَعۡفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ ٢٥﴾ ﴿ [الشورا: ٢٥]]

“তিনি সেই সত্তা যিনি বান্দার তাওবা কবুল করেন, তাদের গুনাহ মাফ করেন এবং তোমরা যা করো সবকিছু তিনি জানেন।” (সূরা আশ-শূরা-২৫)

তিনি বান্দার তাওবা কবুল করেন। কিন্তু শর্ত হলো এখলাসের সাথে তাওবা করতে হবে এবং এরপর ইচ্ছাকৃতভাবে আর সেই গুনাহ পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٣٥ أُوْلَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم

مَّغۡفِرَةٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَجَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ ١٣٦ ﴾ [آل عمران: ١٣٥، ١٣٦]

"যারা অশ্লীল কাজ করে ফেললো কিংবা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে ফেললো, নিজেদের গুনাহর জন্য আল্লাহকে স্মরণ করলো; আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যিনি গুনাহ মাফ করে এবং তারা জেনে শুনে কৃত গুনাহর পুনরাবৃত্তি করে না। তাদের পুরস্কার হলো, আল্লাহর ক্ষমা এবং এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত-তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আমলকারীদের পুরস্কার কতই না উত্তম।" (সূরা আলে ইমরান-১৩৫-১৩৬)

তাওবার পর্যায়গুলো নিম্নরূপ:

-গুনাহের স্বীকৃতি দেয়া

-গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া

-তাওবা করা ও মাফ চাওয়া

-পুনরায় সেই গুনাহ না করার ওয়াদা করা

-সকল পর্যায়ে পূর্ণ এখলাস ও আন্তরিকতা থাকা

-ওয়াদার উপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা।

রমযান আসলে বহু লোক ভাল মানুষ হয়ে যান, নেক কাজে ব্যস্ত থাকেন ও গুনার কাজ থেকে দূরে থাকেন। রীতিমত জামাআতে নামায পড়েন, তারাবী পড়েন, রোযা রাখেন, কুরআন পড়েন, দান-সদকা করেন, ঘুষ, মিথ্যা এবং গালি পালাজ কিংবা নিন্দা অপবাদ থেকে দূরে থাকেন। কিন্তু রমযান চলে গেলে তারা আবার রমযান পূর্ব পশুত্বের দিকে ফিরে যান। তাহলে, তাওবা ও ক্ষমার দাবী পূরণ হলো কোথায়? তারা যদি আবার আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হন, তাহলে ক্ষমা, রহমত ও মাগফেরাত কিভাবে লাভ করবেন? তাওবার উপর টিকে থাকা অত্যন্ত জরুরী।

বন্ধুগণ! ক্ষমার জন্য এর চাইতে বড় আহবান আর কি হতে পারে? বোখারী শরীফে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ঘটনাটি হলো, আগের উম্মাতের এক ব্যক্তি ৯৯টি হত্যার গুণাহ মাফ সম্ভব কিনা তা জানার জন্য একজন আবেদের কাছে যান। আলেম ব্যক্তিটি 'না' বলেন। তখন হত্যাকারী একেও হত্যা করে হত্যার সংখ্যা ১০০ পূর্ণ করেন। তারপর ১০০ হত্যার গুনাহ মাফ সম্ভব কিনা তা জানার জন্য এক আলেমের উদ্দেশ্যে

রওনা করেন। সেখানে গেলে তিনি তাকে বলেন যে তাওবার দরজা অবশ্যই উন্মুক্ত, তবে তুমি যেখানে থাক সেখান থেকে হিজরত করে যেখানে ভালো লোকরা থাকে সেখানে চলে যাও। পথে তার মৃত্যু উপস্থিত হলে নেক ও পাপী লোকের মৃত্যুদানকারী ফেরেশতাদের মধ্যে কে তার রূহ হরণ করবে তা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরে তার তাওবার গন্তব্যস্থল কাছে না প্রস্থানস্থল কাছে তা মাপার নির্দেশ আসে। জরীপে তাওবার নিকটবর্তী হওয়ায় নেক লোকের রূহ হরণকারী ফেরেশতারা তার রূহ হরণ করেন। এই ঘটনা তাওবার মর্ম ও মাহাত্ম্য কি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্যিকারভাবে তাওবা করার তাওফিক দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

«من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار»

‘যে ব্যক্তি নিজ আমলনামা দেখে খুশি হতে চায় সে যেন বেশী করে গুনাহ মাফ চায়।’[30]

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١١٠ ﴾ [النساء: ١١٠]

‘কেউ খারাপ কাজ করে কিংবা নিজের উপর জুলুম করে যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও মেহেরবান দেখতে পাবে।’ (সূরা নিসা: ১১০)

আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٣٥ ﴾ [ال عمران: ١٣٥]

‘যারা অশ্লীল কাজ করে কিংবা নিজের উপর জুলুম করে, এরপর আল্লাহকে স্মরণ করে, নিজেদের গুনাহ মাফ চায় এবং তারা জেনেশুনে কৃত গুনাহর পুনরাবৃত্তি করে না। আল্লাহ ছাড়া কে আছে গুনাহ মাফ করবে?’ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫)

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ وَأَنتَ فِيهِمۡۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمۡ وَهُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ٣٣ ﴾ [الانفال: ٣٣]

‘আপনি তাদের মধ্যে মওজুদ থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে আজাব দেবেন না, যারা গুনাহ মাফ চায়, আল্লাহ তাদের উপরও আজাব দেন না।’ (সূরা আনফাল: ৩৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً»

‘আল্লাহর কসম, আমি দিনে আল্লাহর কাছে ৭০ বারের অধিক তাওবাহ-এস্তেগফার করি।’ [31]

নিষ্পাপ নবী দিনে ৭০ বারের বেশী তাওবা করলে পাপী উম্মাহর সদস্যদের কমপক্ষে ৭০ এবং আরো বেশী তাওবাহ করা উচিৎ।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارٗا ١٠ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا ١١ وَيُمۡدِدۡكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّٰتٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أَنۡهَٰرٗا ١٢ ﴾ [نوح: ١٠، ١٢]

‘অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টি ধারা ছেড়ে দেবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন, তোমাদের জন্য বাগান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদী-নালা প্রবাহিত করবেন।’ (সূরা নূহ: ৯-১২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف»

‘যে ব্যক্তি বলে যে, আমি আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাই, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্যিকার মা‘বুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও ধারক এবং আমি তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো। তাহলে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে যদিও সে জেহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসুক না কেন।’[32]
জেহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা কবীরা গুনাহ। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সাইয়েদুল এস্তেগফার পড়ে এবং এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই দিনে মারা যায়, সে জান্নাতবাসী হবে; আর যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তা পড়ে সকাল হওয়ার আগে রাত্রে মারা যায়, সেও জান্নাতবাসী হবে।

সাইয়েদুল এস্তেগফার হল-

«سيد الاستغفار أن يقول العبد "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتكَ عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»

‘হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া আর কোনো সত্যিকারের মা‘বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দা, সাধ্যমত আপনার ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর টিকে রয়েছি, আমার মন্দ কাজ থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই, আমার উপর আপনার নেয়ামতকে স্বীকার করি, আমার গুনাহ স্বীকার করি, আমাকে মাফ করুন, নিশ্চয়ই আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।’[33]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:
“বান্দা যখন তাওবা করে তখন আল্লাহ তার উপর ভীষণ খুশী হন। যেমন তোমাদের কারো সওয়ারী যদি মরুভূমিতে হারিয়ে যায়, এর পিঠে যদি তোমাদের খাদ্য ও পানীয় থাকে, এটাকে তালাশ করে না পেয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে কোনো গাছের নীচে হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ে এবং তখন যদি হঠাৎ সওয়ারীটি এসে তার কাছে হাজির হয়, সে তখন এর লাগাম ধরে আনন্দের আতিশয্যে ভুলে বলে ফেলে ‘হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব। আল্লাহ তোমাদের এই আনন্দ অপেক্ষা আরো বেশী খুশী হন।”[34]

তাই সর্বদা তাওবা-এস্তেগফার করা দরকার।

তাওবা-এস্তেগফারকারীদের জন্য স্বয়ং আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতা ও এর চারপাশের ফেরেশতারা এই বলে দো‘আ করে যে,
‘যারা তাওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের রব! আপনি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতিদেরকে আপনার প্রতিশ্রুতি চিরকাল বসবাসের জান্নাতে প্রবেশ করান। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন, তাদের প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য।’ (সূরা মুমিন: ৭-৯)

তাওবা-এস্তেগফারের মর্যাদা আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাসহ অন্যান্য ফেরেশতাদের কাছেও অনেক বেশী। ফেরেশতারা নিষ্পাপ। তাদের দো‘আ কবুল হয়। তাওবা করলে ফেরেশতারা তাওবাকারীর পরিবার ও

সন্তানদেরকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য দো'আ করেন। রমযান মুমিনের জন্য কত বড় সৌভাগ্য!

মুমিনের প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর। ত্রুটি করাও কল্যাণকর হতে পারে যদি মানুষ এরপর তাওবা করে বিনীত হয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। মুমিনের প্রত্যেকটি জিনিসই কল্যাণকর। আর এটা মুমিন ছাড়া আর কারো জন্য নয়। সে সুখ ও আনন্দ পেলে শুকরিয়া আদায় করে, সেটা তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ ও কষ্ট পেলে ধৈর্য ধারণ করে; সেটাও তার জন্য কল্যাণকর।

গুনাহ ও ত্রুটি তখন কল্যাণকর হবে, যখন তা মানুষকে অধিক অধিক সওয়াবের কাজ এবং তাওবা-এস্তেগফারের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্য কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে তাওবার সাথে সাথে আরো কিছু নেক কাজ করা কর্তব্য। তা সেই গুনাহর কাফফারা হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন:

[إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ١١٤] [هود: ١١٤]

'নিশ্চয়ই নেক কাজ পাপ ও গুনাহ দূর করে দেয়।' (সূরা হূদ: ১১৪)

তাই পাপ কাজ করলে নফল নামায, রোযা, দান-সদকা, মা-বাপের সেবা, স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহ-মমতা, দ্বীনের দাওয়াত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে বাড়ানো, উপদেশ দান ও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধ করা যেতে পারে। সওয়াবের কাজ করলে ১০ থেকে ৭০০ গুণ এবং গুনাহর কাজ করলে মাত্র ১টা গুনাহর পরিবর্তে ১টা গুনাহ লেখা হয়। তাই নেক কাজ গুনাহকে দূর করে দিতে সক্ষম।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِى بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً»

'আমার বান্দা যখন নেক কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমল করেনি, আমি তার জন্য একটি সওয়াব লিখি। আর যদি আমল করে তাহলে ১০ থেকে ৭০০ গুণ সওয়াব লিখি। যদি গুনাহর কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু এখনও তা করেনি, আমি লিখি না। কিন্তু যদি কাজটি করে ফেলে, তাহলে আমি কেবল ১টি গুনাহ লিখি।'[35]

শুধু তাই নয়, সঠিক তাওবাসহ সত্যিকার ঈমান এবং নেক কাজ করলে আল্লাহ সে গুনাহকে সওয়াবে পরিণত করে দেন। তাওবাকারীর কত বিরাট সৌভাগ্য!

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠ ﴾ [الفرقان: ٦٩]

‘কিন্তু যারা তাওবা করেন, ঈমান আনে এবং নেক আমল করে আল্লাহ তাদের গুনাহকে নেক দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।’ (সূরা ফোরকান: ৬৯)

মানুষ গুনাহ না করলে আল্লাহ অন্য জাতি সৃষ্টি করতেন

গুনাহ বা ত্রুটি-বিচ্যুতি কাম্য নয়। তারপরও গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়। মুমেনের ঈমান ও তাকওয়া যত বেশি হোক না কেন, গুনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব হয় না। কেবলমাত্র নবী-রাসূলগণ ব্যতিক্রম। গুনাহ করাও ভাগ্যের লিখন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُه».

‘আল্লাহ আদম সন্তানের ভাগ্যে যেনার অংশ লিখে রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িয়ে পড়বে। চোখের যেনা হলো দেখা এবং জিহবার যেনা হলো বলা, প্রবৃত্তি কামনা-বাসনা করে এবং যৌনাঙ্গ তাকে হয় সম্পূর্ণ সত্যায়িত করে আর না হয় মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।’[36]

ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় না। গুনাহ করার পর গর্ব-অহংকার না করে আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে গুনাহ মাফ চাওয়া ও তাওবা করা দরকার। তাওবা করলে আল্লাহ গুনাহ মাফ করেন। বান্দা গুনাহ করবে, আল্লাহ তা জানেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক হাদীসে এসেছে:

« وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ ».

‘আমার প্রাণ যার হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা গুনাহ না করলে আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে অন্য একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে এবং তিনি তাদেরকে মাফ করবেন।’[37]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ভাল সনদ সহকারে আরেক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب»

'তোমরা গুনাহ না করলে তোমাদের ব্যাপারে আমার আরো বড় আশংকা হয় যে তোমার আত্মম্ভরিতার বিরাট গুনায় নিমজ্জিত হবে।'[38]

আসলে বান্দা গুনাহ না করলে আল্লাহর غفور (ক্ষমাকারী) নাম কিভাবে হবে? মোটকথা, গুনাহের মধ্যে টিকে থাকা যাবে না। ভুল হবে, ভুল হলে ক্ষমা চাইতে হবে।

গ. রমযান এখলাসের মাস

সকল প্রকার ইবাদত, আনুগত্য ও নেক কাজ কবুলের জন্য শর্ত হলো, এখলাস। এখলাস ছাড়া যে কোনো কাজ এমনকি নেক আমলও ধ্বংস টেনে আনে।

এখলাস অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তির উদ্দেশ্যে নেক কাজ করা। অন্য কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য নেক কাজ করা যাবে না। সাময়িক ও জাগতিক স্বার্থে কিংবা কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, সম্প্রদায়, সংস্থা ও কোনো নেক লোকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো নেক কাজ করা যাবে না। এগুলোর উদ্দেশ্যের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যাবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো মাধ্যমকে সন্তুষ্ট করার টার্গেট করা যাবে না। কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী শরীয়ত ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আর কোনো উসিলা নেই। কোনো নেক ব্যক্তির কবর, আস্তানা, দেবতা, পুরোহিত এবং দরবেশ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হতে পারে না। তাদের কাছ থেকে ইসলামের বিপরীত নয় এমন সব শিক্ষাই শুধু গ্রহণ করা যেতে পারে, এর বেশী নয়। কুরআন ও হাদীসের বর্ণিত পন্থায়ই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে।

রমযান হচ্ছে, প্রশিক্ষণের মাস। তাই ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি ঈমান ও কেবলমাত্র সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে রমযানের রোযা রাখে, আল্লাহ তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেন।

এখানে কেবলমাত্র সওয়াবের কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, এখলাসের সাথে রোযা রাখতে হবে। সওয়াব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালের মুক্তির নিয়ত ছাড়া রোযা রাখার পেছনে আর কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। যেখানে এখলাস ও একনিষ্ঠতা থাকবে সেখানে 'রিয়া' বা লোক দেখানোর মনোভাব থাকতে পারবে না। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোনো নেক কাজ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন না। রমযানের রোযা আমাদেরকে লোক দেখানোর মনোবৃত্তি দূর করার ট্রেনিং দেয়।

যে কোনো ইবাদত অন্য লোক দেখতে পায়। যেমন- নামায, যাকাত, হজ্জ, কুরআন পাঠ ইত্যাদি। এমনকি গোপনে দান করলেও দাতা এবং দান গ্রহীতা কমপক্ষে দুই ব্যক্তি জানতে পারে। কিন্তু রোযার বিষয়টি বান্দা ও আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। কেউ রোযার মাসে গোপনে কিছু খেলে, কিংবা পানিতে ডুব দিয়ে পানি পান করলে কারুর দেখার সাধ্য নেই। একমাত্র আল্লাহর ভয় এবং তার সন্তুষ্টির জন্যই মানুষ রোযা রাখে। সেখানে লোক দেখানোর উদ্দেশ্য নয়; বরং এখলাসের ভিত্তিতে পুরস্কার লাভ করাই উদ্দেশ্য।

আমাদের অতীতের নেক বান্দাগণ এখলাসের কারণে নেক কাজকে গোপন রাখতেন। হাম্মাদ ইবন যায়েদ প্রখ্যাত তাবে'ঈ আইউব সাখতিয়ানী সম্পর্কে বলেছেন, আইউব হাদীস বর্ণনা করার সময় খুবই নরম হয়ে যেতেন এবং একদিকে মোড় নিয়ে নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করতেন। তিনি বলতেন, কি কঠিন সর্দি। কান্না গোপন করার কারনেই বাহ্যিকভাবে মনে হতো যে তার সর্দি হয়েছে।[39]

মুহাম্মদ ইবন ওয়াসে' বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে এমন পেয়েছি যিনি তার স্ত্রীর সাথে একই বালিশে শয়ন করতেন। তার চোখের পানিতে বালিশ ভিজে যেত কিন্তু স্ত্রী টেরও পেতেন না। আমি আরো এমন ব্যক্তিকে দেখেছি যিনি একই কাতারে নামায পড়ছেন, চোখের পানিতে তার গাল ভেসে গেছে কিন্তু পার্শ্বের মুসল্লী আদৌ টের পাননি। তাবে'ঈ আইউব সাখতিয়ানী সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন, তিনি তা গোপন করার জন্য সকাল বেলায় এমনভাবে আওয়াজ দিতেন যেন তিনি এইমাত্র ঘুম থেকে জেগেছেন। ইবনে আবি আদী বর্ণনা করেছেন, দাউদ ইবন আবি হিন্দ ৪০ বছর নফল রোযা রেখেছেন, তার স্ত্রী আদৌ টের পাননি। তিনি ছিলেন কর্মকার। সকাল বেলা সাথে খাবার নিয়ে যেতেন এবং রাস্তায় তা দান করে দিতেন এবং সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে রাতের খানা খেতেন।

মুখলেস লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَٱعۡتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخۡلَصُواْ دِينَهُمۡ لِلَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَسَوۡفَ يُؤۡتِ ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١٤٦ ﴾ [النساء: ١٤٦]

'যারা তাওবা করে, সংশোধন করে, আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে এবং নিজেদের দ্বীনকে এখলাস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে, তারা মুমিনদের সাথে রয়েছে। আল্লাহ শীঘ্রই মুমিনদেরকে মহান বিনিময় দান করবেন।' (সূরা নিসা: ১৪৬)

এই আয়াতে আল্লাহ এখলাস সহকারে নেক কাজের মহান বিনিময়ের কথা ঘোষণা করেছেন।

এখলাসের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। মুখলেস লোকদের জন্য সুসংবাদ। তারা হেদায়েতের বাতি এবং তাদের উপর থেকে সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন ফেতনা কেটে যায়।

দাহহাক ইবন কায়েস থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"أخلصوا أعمالكم لله ، فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له"

‘তোমরা তোমাদের আমলকে এখলাস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করো। আল্লাহ এখলাস ছাড়া কোনো আমল কবুল করেন না।’[40]

অতএব, আল্লাহ এখলাস ও তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত আমল ছাড়া অন্য কোনো আমল কবুল করেন না।’

বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আগের যুগের উম্মাহর গুহায় অবরুদ্ধ তিনজন লোকের এখলাসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাতে তারা তিনজন এমন এমন তিনটি নেক কাজের দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে তাদেরকে মুক্ত করার ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন, যাতে এখলাস ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এর দ্বারাও বুঝা যায় যে, এখলাস বিপদ দূর হওয়ার অন্যতম হাতিয়ার।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এখলাস ছাড়া কোনো আমল গ্রহণযোগ্য হবে না, তাই এই মহান রমযান মাসে এখলাস ও একনিষ্ঠতা অর্জনের প্রশিক্ষণ নিয়ে আমাদের সবাইকে মুখলেস হতে হবে।

ঘ. রমযান দয়া ও দান-সদকার মাস

রমযান দয়া ও করুণার মাস। এই মাসে উপবাসরত মুসলিমরা অভাবী লোকদের দুঃখ সরাসরি অনুভব করতে পারে। রোযাদার হবে সর্বাধিক দয়ালু। ক্ষুধা, পিপাসা ও কষ্টের দাবী হচ্ছে, অন্য মুসলিম ভাইয়ের অভাব দূর করা। হে রোযাদার! অগণিত মানুষ ক্ষুধা ও জঠরজ্বালায় শিকার, তাদের প্রতি নজর দাও, সহস্র লোক কাপড়হীন, তাদেরকে বস্ত্র দাও।

হাদীসে এই মাসকে রহমত, ক্ষমা ও মুক্তির মাস বলা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহই মানুষকে রহম করেন এই মাসে। তাই রোযাদারকেও অন্যের প্রতি দয়া ও রহমতের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

দয়া ও রহমত হচ্ছে আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছে তার অন্তরে এই রহমত দান করেন। আল্লাহ দয়ালু লোকের উপর রহমত নাযিল করেন। আল্লাহ নিজেও দয়ালু এবং মেহেরবান। তিনি বান্দাদেরকে দয়া প্রদর্শনের আহবান জানিয়ে বলেন, তারাও যেন ধৈর্য এবং দয়ার উপদেশ দান করে।

মানুষের অন্তরে দয়া না থাকার অনেক কারণ আছে। সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

ক. অতিরিক্ত গুনাহ ও নাফরমানীর কারণে অন্তরে মরিচা পড়ে। ফলে, তা কঠোর বা পাষাণ হৃদয়ে পরিণত হয়। আল্লাহ ইহুদীদের পাপের কথা উল্লেখ করে বলেছেন:
'তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে পাথরের মতো কিংবা এর চাইতেও বেশী।' (সূরা বাকারা: ৭৪)

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেছেন:

'প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কারণে আমরা তাদের উপর অভিশাপ নাযিল করি এবং তাদের অন্তরকে শক্ত করে দেই।' (সূরা আল মায়েদা: ১৩)

খ. অতিরিক্ত ভোগবিলাসের কারণেও অন্তর শক্ত হয়ে যায়। সেই জন্যই রমযানের আগমন, যেন মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি ও ভোগবিলাসের উপর লাগাম দিতে পারে।

রমযানে সকল পর্যায়ের লোকের উপর দয়া ও মেহেরবানীর অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পিত হয়। সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের জনগণের সাথে নম্রতা ও দয়া প্রদর্শন করা উচিৎ।

শিক্ষক ছাত্রের সাথে নরম ও ভদ্র ব্যবহার করবেন, দয়া ও মেহেরবানী প্রদর্শন করবেন। পরবর্তীতে ছাত্ররাও শিক্ষক হয়ে দয়াবান হবে। অনুরূপভাবে, নামাযের ইমাম মুসল্লীর প্রতি দয়াবান হবেন। তিনি দীর্ঘ কেরাত পড়ে তাদেরকে কষ্ট দেবেন না।

অনুরূপভাবে, দা'ঈকে দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সাথে দয়া দেখাতে হবে। তিনি যেন তাদের কাউকে কষ্ট না দেন। আল্লাহ মূসা ও হারূন (আ:) কে ফেরাউনের কাছে দাওয়াতের নির্দেশ দিয়ে বলেন:
'তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। সম্ভবত সে হেদোয়াত গ্রহণ ও আল্লাহকে ভয় করতে পারে।' (সূরা তা-হা: ৪০)

পিতা সন্তানের সাথে সদয় আচরণ করবেন। তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করলে এর পরিণতি খারাপ হয়। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"ما كان الرفق في شئ إلا زانه ، ولا نزع من شئ إلا شانه"

‘কোন জিনিসের নম্রতা তাকে সুন্দর বানায় এবং নম্রতা প্রত্যাহার করা হলে তা মন্দে পরিণত হয়।’[41]

সাহাবায়ে কেরাম অভাবী ও গরীবদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো ফকীর মিসকীন ছাড়া ইফতার করতেন না। তিনি ইফতারের জন্য কোনো গরীব লোক না পেলে সেই রাতে না খেয়ে থাকতেন। তিনি খানা খাওয়ার সময় কোনো গরীব লোক সাহায্য প্রার্থনা করলে নিজের ভাগের খাবারটুকু দান করে দিতেন। কোনো সময় ঘরে ফিরে দেখতেন যে আর কোনো খাবার নেই। তখন তিনি না খেয়ে রাত কাটিয়ে দিতেন।

একবার ইমাম আহমদ (র) রোযা ছিলেন। তাঁর জন্য ইফতারের উদ্দেশ্যে দুটো রুটি তৈরি করা হয়। ভিক্ষুক আসায় তিনি তা ভিক্ষুককে দিয়ে দেন এবং নিজে না খেয়ে রাত কাটিয়ে দেন।

রমযান দান-সদকার মাস

রমযান সকল নেক কাজের জন্য অধিক সওয়াবের মাস। দান-সদকা রমযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও করণীয়। রোযার উপবাসের মাধ্যমে গরীব-দুঃখী মানুষের কষ্ট বুঝার পর তা দূর করার জন্য বাস্তব ব্যবস্থা হলো দান-সদকাহ করা। আর এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মাসে বড় দাতা হওয়া সত্ত্বেও রমযানে তিনি আরো বেশী দান করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত,

"كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أجد الناس و كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه الملك جبريل عليه السلام و كان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال : فلرسول الله صلى الله عليه و سلم أجود بالخير من الريح المرسلة "

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিতেই সর্বাধিক দানকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি রমযানে জিবরীল (আ) এর সাথে সাক্ষাতের পর প্রবাহমান বাতাসের মতো উন্মুক্ত হস্ত ও অধিকতর দাতা হয়ে যেতেন।’ [42]

অতএব, ‘রমযানের দান-সদকাহ সর্বোত্তম।’ যে কোনো ইবাদতের সওয়াব নীচে ১০ থেকে শুরু হয় এবং উপরের দিকে ৭শ বা আরো অধিক সম্প্রসারিত। কিন্তু একমাত্র আল্লাহর পথে দানের সওয়াব নীচে ৭শ থেকে শুরু হয় এবং উপরের দিকে আরো বেশী। ১০ থেকে শুরু হয় না। এটা দান-সদকার বৈশিষ্ট্য। এ মর্মে আল্লাহ

কুরআনে বলেন:

﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١ ﴾ [البقرة: ٢٦١]

‘যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের অর্থ-সম্পদ দান করে তাদের দানের উদাহরণ হলো একটি বীজের মতো, যা থেকে ৭টি শিষ বা ছড়া জন্মায়। প্রত্যেকটি ছড়ায় একশ দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আরো বেশী দান করেন। আল্লাহ অতি দানশীল ও সর্বজ্ঞ।’ (সূরা বাকারা: ১৬১)

বেশী সওয়াবের আশায় রমযানে বেশী বেশী দান করা উচিৎ। কেননা, অন্য ইবাদতে এত বেশী সওয়াব নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجۡرٞ كَبِيرٞ ٧ ﴾ [الحديد: ٧]

‘তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তিনি তোমাদেরকে যে সম্পদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন- তা থেকে ব্যয় করো।’ (সূরা হাদীদ: ৭)

এ আয়াতে সম্পদের মালিক আল্লাহ মানুষকে সম্পদের প্রতিনিধি বানিয়ে তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা যেন সম্পদ আঁকড়ে ধরে না রাখি। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٠ ﴾ [المنافقون: ١٠]

‘আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় করো। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার রব, আমাকে আরো কিছুকাল অবকাশ দিলেন না কেন? তাহলে আমি দান-সদকাহ করতাম এবং নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।’ (সূরা মুনাফেকুন: ১০)

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧ ﴾ [التغابن: ١٧]

‘তোমরা যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কর্জে হাসানা দাও, তাহলে আল্লাহ তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন, আল্লাহ শোকর গুজার ও ধৈর্যশীল।’ (সূরা তাগাবুন: ১৭)

এ আয়াতেও দান করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে

দান-সদকা দ্বারা গুনাহ মাফ হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمۡۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٧١ ﴾ [البقرة: ٢٧١]

‘তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান-সদকা করো, তাহলে তা কতইনা উত্তম। আর যদি তা গোপনে গরীব ও অভাবীদেরকে দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তোমাদের আমলের বেশী খবর রাখেন।’ (সূরা বাকারা: ২৭১)

দান-সাদকাহ দ্বারা সম্পদ কমে না, বান্দা যখন দানের হাত বাড়ায়, তখন তা অভাবীর হাতে পড়ার আগে প্রথমে আল্লাহর হাতে পড়ে, যে অভাবমুক্ত ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায়, আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা খুলে দেন।

দান করলে সম্পদ কমে যাওয়ার ভয় থাকে। বরং সম্পদ কমে না। আল্লাহ তা আরো বাড়িয়ে দেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

"ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ"

‘হাশরের দিন দান-সাদকাহ বান্দার জন্য ছায়া হবে।’ [43]

সেদিন প্রখর তাপের মধ্যে ছায়ার প্রয়োজন হবে অত্যধিক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

"فاتقوا النار ولوبشق تمرة"

‘তোমরা খেজুরের একটি টুকরা দান করে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচো।’[44]

দান করলে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচা যায় বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন।

মু‘আয ইবন জাবাল থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

"ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار"

‘আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাগুলো সম্পর্কে বলবো না? আমি বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন, রোযা হলো ঢালস্বরূপ। পানি যেমনি আগুন নিভায়, দান-সাদকাহ তেমনি গুনাহ নিভায়।’[45]

এ হাদীসে দান-সাদকাহ দ্বারা গুনাহ মাফ হয় বলে জানা যায়।

গরীবরাও দান করবে, যদিও তা সামান্যই হোক না কেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন,

" أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ"

“তোমাদের কার কাছে নিজের মাল-সম্পদ অপেক্ষা ওয়ারিসের মাল-সম্পদ অধিক প্রিয়? সাহাবারা বলেন, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার কাছে আপন সম্পদ অধিকতর প্রিয় নয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিজ সম্পদ বলতে বুঝায় যা সে ব্যয় করেছে, আর যা রয়ে যাবে সেটাতো ওয়ারিসের সম্পদ।’[46]

এ হাদীসে কুক্ষিগত সম্পদকে ওয়ারিসের সম্পদ বলা হয়েছে। কেননা, ব্যক্তির মৃত্যুর পর ওয়ারিসরা তার মালিক হবে, ব্যক্তি নিজে তার মালিক নয়। অথচ, মানুষ নিজের জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে কম, আর সম্পদের মায়ার কারণে রেখে যায় বেশী- যা তার কোনো কাজে আসবে না। যেটা দ্বারা ওয়ারিসরাই উপকৃত হবে।

দান-সাদকার মধ্যে সাদকাহ জারিয়াহ উত্তম। সদকাহ জারিয়াহ হলো, যার ফলাফল দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। যেমন: মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, রাস্তাঘাট ও পুল তৈরি ইত্যাদি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

‘আমার কাছে যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা থাকে তাহলে আমি তা তিন দিনের মধ্যে ব্যয় করা ছাড়া আনন্দ পাবো না। তবে ঋণ পরিশোধের জন্য রাখা অংশ ব্যতীত।[47]

সাহাবী আবদুর রহমান ইবন আওফ একবার মদীনার গরীব লোকদের মধ্যে ৭শ উটের বোঝাইকৃত বিশাল সম্পদ দান করেন।

রমযানে আমাদের নেককার পূর্বসূরীদের মসজিদগুলোতে পর্যাপ্ত ইফতার সরবরাহ করা হতো। তারা এর মাধ্যমে বিরাট সওয়াব লাভ করেন।

আজও আমাদের উচিৎ গরীব-মিসকীনদেরকে ইফতার করানো।

হাদীসে কুদসীতে এসেছে,
মহান আল্লাহ বলেন: ব্যয় করো, আমিও তোমার জন্য ব্যয় করবো[48]।

অন্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا

“তিনটি বিষয়ে আমি শপথ করে বলছি, দান দ্বারা সম্পদ কমে না। আর যখনই কোনো মানুষের উপর যুলুম হওয়ার পরে সে সবর করে তখনই আল্লাহ সেটার কারণে তার সম্মান বাড়িয়ে দেন, আর যখনই কোনো বান্দা যাচঞার পথ উন্মুক্ত করবে তখনই আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা উন্মুক্ত করবেন অথবা অনুরূপ কথা বলেছেন।”

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ "

“দুনিয়ায় চার ধরনের লোক আছে।

১. এক বান্দাকে আল্লাহ এলেম ও সম্পদ দিয়েছেন। সে এ ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে তাকওয়ার অনুসরণ করে, আত্মীয়তার অধিকার পূরণ করে এবং সম্পদে যাদের হক আছে সে হক আদায় করে, তার মর্যাদা সর্বোত্তম।
২. অন্য বান্দাকে আল্লাহ এলেম দিয়েছেন, কিন্তু সম্পদ দেননি। সে সত্য নিয়তে বলে, যদি আমার সম্পদ থাকতো, তাহলে আমি অমুক অমুক নেক কাজ করতাম। তার নিয়তের কারণে উভয়ের মর্যাদা সমান হবে।
৩. আরেক বান্দাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু এলেম দেননি, সে এলেম না থাকার কারণে সম্পদের মধ্যে ডুবে আছে, আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন না করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে না এবং সম্পদে আল্লাহর যে অধিকার আছে তা পূরণ করে না। এ ব্যক্তি হলো সর্বনিকৃষ্ট।
৪. এক বান্দাকে আল্লাহ অর্থ ও এলেম কিছুই দেননি। সে বলে, যদি আমার অর্থ-সম্পদ থাকতো, তাহলে আমি অমুক (গুনাহের) কাজ করতাম। তার নিয়তের কারণে উভয় ব্যক্তির সমান গুনাহ হবে[49]।

মোটকথা, দানের বহু উপকারিতা আছে। এতে গুনাহ মাফ হয়, মর্যাদা বাড়ে, জাহান্নাম থেকে আড়াল হয়, সম্পদ বাড়ে ও বরকত নাযিল হয়, হাশরের ময়দানে ছায়া হবে, অমঙ্গলের দরজা বন্ধ হয়, খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচা যায়। দান করলে ফেরেশতারা বিনিময়ের জন্য দো'আ করে ইত্যাদি। তাছাড়া দানের মাধ্যমে সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায় যা আর কোনো ইবাদতে নেই। দানের সর্বনিম্ন সওয়াব হলো ৭শ গুণ। দানের দ্বারা অভাবী মানুষ তৃপ্ত হয় এবং তারা দাতার জন্য দো'আ করে। ফেরেশতারা পর্যন্ত দো'আ করে। সুতরাং দানের কি অসীম মর্যাদা!

৬. রমযান ধৈর্য ও সংযমের মাস

বাস্তব জীবনে ধৈর্যের প্রয়োজন অনেক বেশী। তাই আল্লাহ রমযানকে ধৈর্যের একটি বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মাঝে মাঝে ধৈর্য কমে যায়। তখন পানাহার ও যৌন চাহিদা থেকে দীর্ঘ এক মাস বিরত রাখার মাধ্যমে তাকে মজবুত করা হয়। দাওয়াতে দ্বীন ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কষ্ট সহ্য করার জন্য ধৈর্যের ভীষণ প্রয়োজন। শত্রুরা কিংবা অজ্ঞ লোকেরা গালি-গালাজ ও হাসি-ঠাট্টা করবে। ধৈর্যের সাথে এর মোকাবিলা করে হেকমতের সাথে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে। জিহাদে জান-মালের কোরবানীর জন্য সর্বাধিক ধৈর্য ধারণা না করে উপায় কি? কিন্তু তা কত কঠিন! ধৈর্য ধারণ করতে পারলে তাদের জন্য আল্লাহ পুরষ্কারে সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦ ﴾ [البقرة: ١٥٥، ١٥٦]

‘সরবরাহকারীদেরকে সুসংবাদ দিন যারা বিপদগ্রসস্ত হলে বলে, অবশ্যই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।’ (সূরা আল বাকারা:১৫৫-১৫৬)

কোনো কিছু হারিয়ে গেলেও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। বিভিন্ন বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে। অভাব-অনটন ও দারিদ্র দেখা দিলে হারাম আয়ের প্রাচুর্যের দিকে না গিয়ে সীমিত হালাল রোজগারের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]

‘যারা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তিনি তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন এবং এমনভাবে রিজিক দান করবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।’ (সূরা আত তালাক:২-৩)

বাস্তব জীবনের প্রতিটি পদের ধৈর্যের প্রয়োজন। যার ধৈর্য বেশী, তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি বেশি। তিনি সবার কাছে প্রিয়পাত্রে পরিণত হবেন। পক্ষান্তরে, যার ধৈর্য কম তিনি সবার কাছে অপ্রিয়, খিটখিটে মেজাজ কিংবা বদমেজাজী বলে পরিচিত হবেন। লোকেরা তার কাছ থেকে দূরে সরতে চাইবে।

একজন মুসলিম থেকে যদি অন্যরা দূরে সরে যায় তাহলে তিনি কিভাবে দাওয়াতী কাজ ও সমাজ সংশোধনের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন?

ধৈর্য মুমিনের সাফল্যের চাবিকাঠি। তাই প্রবাদ আছে, ‘ধৈর্য প্রশস্ততার চাবিকাঠি।’ রোযার অপর নাম হচ্ছে সবর। এতে বুঝা যায়, রমযানের সাথে ধৈর্যের মূল অর্থ ও তাৎপর্যের বিরাট মিল রয়েছে। রোযায় আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো পরহেজ করে চলতে হয়। এটা হচ্ছে ধৈর্যের অর্ধেক। অপর অর্ধেক হচ্ছে তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত করা। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٖ ١٠ ﴾ [الزمر: ١٠]

‘ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিনা হিসেবে তাদের পুরষ্কার দেওয়া হবে।’ (সূরা যুমার:১০)

ধৈর্যের পুরষ্কার কত বিরাট আমরা সহজেই তা অনুমান করতে পারি। আল্লাহ তাদেরকে বেহিসাবে পুরষ্কারে ভূষিত করবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ [إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٣ ﴾ [البقرة: ١٥٣] ﴿

‘আল্লাহ ধৈর্য ধারণকারীদের সাথে আছেন।’ (সূরা আল বাকারা:১৫৩)

ধৈর্যের সাথে রমযানের সম্পর্ক কি তা আমাদেরকে বুঝতে হবে। ধৈর্য তিন প্রকার। ১. আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের কষ্ট স্বীকারের ধৈর্য, ২. আল্লাহর নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য যে কষ্ট হয় সে ব্যাপারে ধৈর্য, ৩. তাকদীর বা ভাগ্যের কষ্টদায়ক জিনিসের মোকাবিলায়ও ধৈর্য ধারণ করতে হয়।

রমযানের মধ্যে এই তিন ধরনের ধৈর্যই পাওয়া যায়। কেননা, রমযানে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা এবং নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার কষ্ট আছে। এছাড়াও ক্ষুধা-পিপাসা, শারীরিক দুর্বলতাসহ ভাগ্যলিপির যন্ত্রণা এবং কষ্টও রয়েছে। এজন্য রমযানকে ধৈর্যের মাস বলা হয়েছে। তাই এ মাসে ধৈর্যের প্রশিক্ষণ নিতে হবে এবং পরবর্তীতে তার বাস্তবায়ন করতে হবে।

ধৈর্যের আরো অনেক ফযীলত আছে। বিপদ আসলে সবরের প্রশ্ন দেখা দেয়। সেই বিপদে মুমিনকে ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিতে হয়। সকল পরীক্ষা ও বিপদ-আপদে সবরের প্রশ্ন জড়িত। রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে রয়েছে ধৈর্যের উত্তম নমুনা। তিনি যখন দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফে গিয়ে প্রহৃত হন, তখন তাদের জন্য অধৈর্য হয়ে বদ দো‘আ করেননি। বরং বলেছেন, হে আল্লাহ! তারা অজ্ঞ, তারা জানে না, আপনি তাদেরকে হিদায়াত করুন।

হিজরতের গোপন অভিযানের সময় এক পাহাড় কষ্টের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও বদদো‘আর একটিমাত্র বাক্যও উচ্চারিত হয়নি তাঁর পবিত্র মুখ থেকে। শুধু ধৈর্য দিয়েই তিনি এ কঠোর পর্যায় অতিক্রম করেছেন।

অনুরূপভাবে, মক্কায় তাকে জাদুকর, গণক ও পাগল বলে গালি-গালাজের ঝড়ের মুখে অটল পাহাড়ের মতো ধৈর্য ধারণ করেছেন। নবী ইবরাহীম (আ) কে নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সময় তাঁর কোনো পেরেশানী ছিল না। সন্তুষ্টিচিত্রে ও হাসিমুখে তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

খুবাইব ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে মক্কার কুরাইশরা যখন হত্যার উদ্দেশ্যে শূলে চড়ানোর প্রস্তুতি নেয় তখন চরম ধৈর্য ছাড়া তাঁর মুখ থেকে আর কোনো শব্দ ও পেরেশানী উচ্চারিত হয়নি।

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে হাঁটার সময় তাঁর পা এক শোয়া ব্যক্তির গায়ে লাগে। লোকটি বললো, তুমি কি পাগল? ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, ‘না’। খলীফা ওমরের রক্ষীরা বললেন, হে

আমীরুল মোমিনীন! এই বে'আদব লোকটিকে শাস্তি দেওয়া দরকার। খলীফা বললেন, সে জিজ্ঞেস করেছে আমি পাগল কিনা, আমি উত্তর দিয়েছি, 'না'। এরপর আর শাস্তির কি থাকতে পারে?

ব্যক্তি,পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনকে সুখী ও উত্তেজনামুক্ত রাখার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। আর রমযান ও ধৈর্যের সওগাত নিয়েই বছরে একবার আমাদের দুয়ারে হাজিরা দেয়।

চ. রমযান কঠোর শ্রম ও প্রশিক্ষণের মাস

রমযান হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম ও শ্রম সাধনার প্রশিক্ষণের মাস। পরবর্তী এগার মাসে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার জন্য এই মাসে বার্ষিক প্রশিক্ষণের ৩০ দিনব্যাপী দীর্ঘ কোর্স সমাপ্ত করতে হয়। এটা হচ্ছে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স। আমরা জানি, যে কোনো কাজের জন্য পরিশ্রম প্রয়োজন। লেখা-পড়ায় পরিশ্রম আছে। রুজি-রোজগারেও পরিশ্রম আছে। কৃষিকাজ, চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, সন্তানের প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষা, সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ, যুদ্ধ, সন্ধি, দাওয়াতে দ্বীন, দ্বীনি আন্দোলন ও জিহাদ ইত্যাদি কাজে পরিশ্রম রয়েছে। বরং যে যত বেশী পরিশ্রম করবে তার সাফল্যও ততবেশী হবে। গোটা বছরের ইবাদত তথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ অন্যন্য ইসলামী দায়িত্ব পালনেও কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। রোযা মানুষকে কিভাবে এই কঠোর শ্রমের ট্রেনিং দেয়?

দুনিয়ায় মানুষের চেষ্টা তদবীরকে দুইভাবে ভাগ করা যায়।

1.ভোগ-বিলাসের জন্য কামাই-রোজগারের চেষ্টা।

2.পারলৌকিক শান্তি ও মুক্তির জন্য আল্লাহর ইবাদতের চেষ্টা-প্রচেষ্টা।

মানুষ সাধারণতঃ প্রথমোক্ত কাজেই নিজের বেশীরভাগ সময়, মেধা ও যোগ্যতাকে ব্যবহার করে। উদ্দেশ্য হলো, গাড়ী-বাড়ি ও শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পদের প্রাচুর্য অর্জন করা। আর এক সকল কিছুর মূলে হচ্ছে, ভালভাবে পানাহার করা, সুস্বাদু ও ভাল খাবার গ্রহণ করা এবং নিজের রসনা পূর্ণ করা ও ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করা। কিন্তু রোযা মানুষের এই সর্বাধিক প্রিয় চাহিদার লাগাম টেনে ধরে পুরো দিন সুস্বাদু খাবার থেকে বিরত থাকতে বলে।

যেই খাবারের জন্য গোটা দুনিয়ায় মানুষে হন্যে হয়ে ঘুরছে এবং লড়াই-ঝগড়া মারামারিতে লিপ্ত রয়েছে, সেই মানুষকে খাবার থেকে পুরো দিন বিরত রাখা যে কি কষ্ট তা আমরা অন্য মাসে তুলনা করে বুঝতে পারবো।

অন্য মাসে সকালের নাস্তা কিংবা দুপুরের খাবার যদি নির্ধারিত সময়ের চাইতে ঘন্টা দেরী হয় তখন আমরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং আর কাজ করা যাবে বলে মত প্রকাশ করি। তখন এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকেও আমরা খাওয়ার কথা বলে বিরতি নিতে পারি। একবেলা খাওয়া বন্ধের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া কি হবে তা দেরীতে খাবারের ক্লান্তি ও দুর্বলতার মানসিকতা থেকেই সহজে অনুমান করা যায়। অথচ রমযানে একাধারে দুই বেলা খাওয়া বন্ধ রাখা হয়। এতে অবশ্যই কষ্ট আছে। সেই কষ্ট ২দিন, ৪দিন কিংবা ১ সপ্তাহ পর্যন্ত হলেও মানকে শান্ত্বনা দেওয়া যেত। কিন্তু দীর্ঘ ১টি মাস এভাবে পরিশ্রম করতে হয়।

পানির পিপাসার কষ্ট তো খাবারের চাইতেও মারাত্মক। কোনো পরিশ্রম বা কাজ করে আসার পর খানা একটু দেরীতে হলেও চলে। কিন্তু পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যায়। রোদ থেকে আসলে তো আরো ভয়াবহ অবস্থা! কিন্তু রোযার মধ্যে তো দিনে খাদ্য ও পানীয় নিষিদ্ধ। দীর্ঘ ৩০ দিন যাবত একটানা এত কঠোর পরিশ্রম। এ ছাড়াও রয়েছে মানুষের পরবর্তী প্রিয় ও প্রয়োজনীয় বিষয় যৌন বাসনা পূরণ করা। কিন্তু রোযার মধ্যে দিনে তা নিষিদ্ধ। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঁধার প্রাচীর তুলে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার অভ্যাস সৃষ্টি করা হয় দীর্ঘ এক মাসব্যাপী এই রমযানে।

সন্ধ্যায় সূর্য ডুবার সাথে সাথে ইফতার। কিন্তু শরীরের অবস্থা হচ্ছে খুবই দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত। তখন যদি ইফতারের পর শুয়ে আরাম করা যেত, কতইনা ভাল হতো! কিন্তু সামান্য পরেই একামতে বলা হচ্ছে, ‘কাদ কামাতিস সালাহ’ অর্থাৎ নামায শুরু হয়ে যাচ্ছে। ক্লান্তির দাবী ছিল, মাগরিব না পড়া ও রমযানে তা মাফ করে দেওয়া কিন্তু তাতো হয়নি।

মাগরিব থেকে আসার পর শরীরের দাবী হচ্ছে, পূর্ণ বিশ্রাম তথা ঘুম। কিন্তু একটা পরেই রয়েছে এশা ও তারাবারী নামাযের আহবান। অবসাদগ্রস্ত শরীরের যেখানে এশা পড়াই দায়, সেখানে আবার রয়েছে তারাবীর মতো অতিরিক্ত নামাযের ব্যবস্থা। তাও যদি ২/৪ রাকাত হতো, তাহলে কোনো রকম চলতো। কিন্তু তা কমপক্ষে ৮/১০ রাকাত থেকে ২০ রাকাত পর্যন্ত। যদি তা সংক্ষিপ্ত সূরার মাধ্যমে শেষ করা হতো, তাহলে বাঁচা যেত। কিন্তু তাতেও আবার খতমে কুরআন উত্তম। বলতে গেলে পরিশ্রমের উপর পরিশ্রম এবং কষ্টের উপর কষ্ট। যাকে বলে শাঁকের উপর আঁটির বোঝা।

তারাবীর নামায শেষ করে ফিরে এসে ফজর পর্যন্ত একটানা শুয়ে থাকা হচ্ছে ক্লান্ত শরীরের অনিবার্য দাবী, কিন্তু তাও পূরণ করা যাচ্ছে না। ভোর রাত্রে উঠে সেহরী খাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সারা রাত জেগে জেগে ইবাদত ও তাহাজ্জুদ পড়ার তাগিদ। এর দ্বারা কি এ কথা বুঝা যায় না যে, রমযানে আরামের সর্বশেষ চিহ্নটুকুকেও মুছে দেয়ার চেষ্টা কার্যকর আছে? পরিশ্রমের উত্তম কর্মসূচী এর চাইতে আর কি হতে পারে? দীর্ঘ একমাস একটানা এই কঠোর শ্রম-সাধনার পেছনে আল্লাহর যে ইচ্ছা কাজ করে, তা হলো, মুসলিম মিল্লাত কখনো অলস, শ্রম বিমুখ ও নিষ্ক্রিয় হতে পারে না। জগতের চাকাকে সচল রাখার জন্য তাদেরকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে। তাহলে, আল্লাহর কোনো আদেশ নিষেধই তাদের কাছে কঠিন মনে হবে না।

একাকী ও ব্যক্তিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই প্রশিক্ষণের সুযোগ দিলে কারুর পক্ষেই ৩০ দিনব্যাপী রোযা রাখা সম্ভব হতো না। কিন্তু রমযানের বরকতে আল্লাহ এ সকল কষ্ট এতো সহজ করে দিয়েছেন যে, রমযান কিভাবে শেষ হয়ে যায় রোযাদারেরা তা টেরও পায় না।

রমযানে আমাদের করণীয়

রমযান মাস মুসলিমের জন্য আল্লাহর বিরাট নেয়ামত। এ মাস কল্যাণ ও সৌভাগ্যপূর্ণ। এটি হচ্ছে নেক কাজের মওসুম। এই মওসুমে নেক কাজ করার সুযোগ অনেক বেশী। তাই একজন মুমিন নিজে ঈমান ও আমলকে উন্নত করার জন্য ১১ মাস অপেক্ষা করে। যারা বেশী বেশী নেক কাজ করে এই কাজে লাগাতে পারে, তারা কতই না সৌভাগ্যবান! পক্ষান্তরে, যারা এই মাসকে কাজে লাগাতে পারে না, তারা অবশ্যই হতভাগ্য।

রমযানের আমাদের করণীয়গুলো নিম্নরূপ:

1. রমযান তাকওয়ার মাস। তাই সিয়াম সাধনার মাধ্যমে অধিকতর তাকওয়া অর্জন সম্ভব।

2. এই মাসে বড় বড় শয়তানদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। রমযানের প্রতি রাত্রে রোযাদার মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। রমযানের শেষ এক রাত্রেই সারা মাসের সমান সংখ্যক লোককে মুক্তি দেওয়া হয়। সেমতে আমাদের বেশী করে নেক আমল করা উচিত।

3. এই মাসে কদরের রাত রয়েছে, যা হাজার মাসের চাইতেও উত্তম। শ্রমিক কর্মদিবসের শেষে যেমন পারিশ্রমিক পায়, রোযাদারও তেমনি রমযানের শেষ দিন ক্ষমা লাভ করে। সূতরাং আমাদের উচিত কদরকে অন্বেষণ করা।

4. অন্য মাসে যে কোনো নেক কাজের বিনিময়ে ১০ থেকে ৭শ গুণ। কিন্তু রমযানের রোযার প্রতিদান এর চাইতেও অনেক বেশি। আল্লাহ নিজ হাতে সেই সীমা-সংখ্যাহীন পুরষ্কার দান করবেন। তাই আমাদের বেশী করে নেক আমল করা উচিত।

5. এই মাস দান-সদকার মাস। এই মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক দান

করতেন। অতএব আমাদের উচিত এ মাসে যাকাত আদায় করা এবং সার্মথানুযায়ী নফল দান সাদকাহ করা।

6. রমযান মাসে কুরআন নাজিল হয়েছে, তাই এটি কুরআনের মাস। ফলে আমাদের বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করা উচিত।

7. রমযান হচ্ছে জেহাদের মাস। এই মাসে মুসলিমদের বড় বড় ঐতিহাসিক বিজয় সাধিত হয়েছে। তাই এটাকে কুরআনে বিজয়ের মাসও বলা হয়েছে।

8. এই মাসে এতেকাফ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমযানে এতেকাফ করতেন।

9. ইফতার রমযানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইফতারের সময় দো'আ কবুল হয়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো বেশী করে ইফতারের সময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

10. এই মাসের ওমরায় হজ্জের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। অতএব, আমাদের যাদের সামর্থ আছে তাদের এ মাসে ওমরার সুযোগ নেয়া ।

11. রমযান সবর ও ধৈর্যের মাস। আমাদের সবার এ থেকে ধৈর্যের শিক্ষা নেয়া আবশ্যক।

12. রমযান রাত্রি জাগরণের মাস। এই মাসে সালাতুল কেয়াম অর্থাৎ তাহাজ্জুদসহ তারাবীর নামায পড়া হয়। তারাবীর নামায দ্বারা অতীতের সকল গুণাহ মাফ হয়ে যায়। তাই আমাদেরকে তারাবীহ পড়ার গুরুত্বারোপ করতে হবে।

13. রমযানে সাদাকাতুল ফিতর দিতে হয়। এর মাধ্যমে রোযার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হয়।

14. রোযার মাধ্যমে মুখ-চোখ ও কানকে সংযত রাখার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ থেকে নিন্দা-গীবত, অপবাদ ও চোগলখুরীর মতো সামাজিক ব্যাধি হ্রাস পাওয়া সম্ভব হয়।

15. রমযান হচ্ছে তাওবার মাস। তাওবার মাধ্যমে গুণাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

16. রোযার উপবাসের মাধ্যমে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর অভাবী মানুষের দুঃখ বুঝা সহজ এবং এভাবেই রোযা মুসলিমদের মধ্যে সহানুভূতি, মমত্ব ও ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করা যায়।

আমরা রমযানের মূল শিক্ষা যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারি। রমযান যেন আমাদের জীবনে গতানুগতিক না হয়ে কল্যাণ ও মুক্তির প্রতীক হতে পারে সে চেষ্টা সবাইকে করতে হবে। আল্লাহ আমাদের জীবনে রমযানকে

বারবার ফিরিয়ে আনুক, এটাই হোক আমাদের প্রার্থনা।

---

[1] বুখারী,খ২,পৃ.৭০৭,হাদীস নং ১৯০৫।

[2] সহীহ মুসলিম,পর্ব:১৩, সাওম,অধ্যায় ৩০,হাদীস নং১১৫১।

[3] সহীহ বুখারী,খ.২,সাওম অধ্যায়,হাদীস ১৭৯৭,সহীহ মুসলিম , সাওম,অধ্যায়,হাদীস নং১১৫২।

[4] নাসাঈ,খ২,পৃ.৯২,হাদীস নং২৫২৯।

[5] মুসনাদে আহমদ, খ,১৫,পৃ১২৩,হাদীস নং ৯২২৫।

[6] সহীহ বুখারী,পর্ব ৩০,সাওম অধ্যায়৪,হাদীস ১৮৯৬,সহীহ মুসলিম,পর্ব:১৩, সাওম,অধ্যায় ৩০,হাদীস নং১১৫১।

[7]আহমদ, খ.২,পৃ.১৭৪,হাদীস নং ৬৬২৬।

[8] মুসলিম,পৃ.১৪৪,খ.১,হাদীস নং ৫৭৪।

[9] সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং৪০৯।

[10]সহীহ ইবনে খুযাইমা,খ.৩,পৃ.১৮৮,হাদীস নং ১৮৪২।

[11] সূরা আল বাকারাহ: ১৮৩।

[12] মুসনাদে আহমদ,খ২,পৃ.৩৭৩।

[13] বোখারী,খ.১,হাদীস নং ১।

[14] বুখারী,খ১,হাদীস নং ৫২।

[15] তিরমিযী, কিতাবুল কদর,খ.১৩পৃ.২১, হাদীস নং ৩৮৬৪।

[16] মুসলিম,খ ৫,পৃ. ৫০,হাদীস নং ৪১৭৭।

[17] জামেউল উসূল,খ১০,পৃ.ও হাদীস নং.৮১৩১।

[18] মুসনাদে আহমাদ,খ.৪,পৃ.১৪১।

[19] বুখারী,খ৫,পৃ.২৩৭৬,হাদীস নং ৬১০৯।

[20] শারহে ইদ্দত মুতুন ফীল আকীদাহ,খ,১৮,পৃ ২৪০।

[21] বুখারী,খ৫,পৃ.২২৪০,হাদীস নং ৫৬৭৩।

[22] তিরমিযী,খ.৩,পৃ.৮৭,হাদীস নং ৭০৭।

[23]বুখারী,খ.২,পৃ.৬৭৩,হাদীস নং১৮০৫।

[24] মেরকাত শরহে মেশকাত- মোল্লা আলী কারী (রহ.)।

[25] সাপ্তাহিক আদ্দাওয়াহ, ১০-২-১৯৯৪, রিয়াদ, সৌদি আরব।

[26]প্রাগুক্ত।

[27]প্রাগুক্ত

[28] তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম, আব্দুল্লাহ নাসের আলওয়ান, প্রঃ ১৯৮১ দারুস সালাম, বৈরুত।

[29] সহীহ মুসলিম,খ.৮,পৃ.৯৯,হাদীস নং৭১৬৫।

[30] বায়হাকী-শুআ'বুল ঈমান, আলবানী একে বিশুদ্ধ হাদীস বলেছেন,সহীহ কুনুযিস সুন্নাহ,খ১,পৃ.৮০।

[31] মুসনাদে আহমাদ,খ১৪,পৃ১৯১,হাদীসনং ৮৪৯৩।

[32] সহীহ মীন কুনুযিস সুন্নাহ,খ.১,পৃ.৭৯।

[33] প্রাগুক্ত।

[34] সহীহ মুসলিম,খ১,পৃ.৮২,হাদীস নং৩০৫।

[35] সহীহ মুসলিম,খ১,পৃ৮২,হাদীস নং ৩৫০।

[36] বুখারী,খ ১৫,পৃ ৫৩৫,হাদীস নং ৬২৪৩।

[37] সহীহ মুসলিম,খ ৮,পৃ৯৪,হাদীস নং ৭১৪১।

[38] বায়হাকী, শুআবুল ঈমান,খ৫,পৃ.৪৫৩,হাদীস নং ৭২৫৫। শাইখ আল-আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, সহীহুল জামে‘।

[39]কাইফা নাঈসু রামাদান- আব্দুল্লাহ সালেহ, দারু ওয়াতান প্রকাশনী রিয়াদ, প্রকাশ- ১৪১১ হি:।

[40] কানযুল উম্মাল,খ৩,পৃ২৩,হাদীস নং৫২৫৮।

[41] কানযুল উম্মাল,খ৩,পৃ৩৮,হাদীস নং৫৩৬৭।

[42] শুআবুল ঈমান,খ২,পৃ ৪১৩,হাদীস নং ২২৪৬।

[43] সহীহ ইবনে খোযাইমা,খ ৪,পৃ.৯৫,হাদীস নং২৪৩২।

[44] সহীহ মুসলিম,খ২,পৃ.৭০৩, হাদীস নং ১০১৬।

[45] ইমাম নববী, আল আরবাউন,খ.১,পৃ.২৯।

[46] বুখারী,খ১৬,পৃ ২৫১,হাদীস নং ৬৪৪২।

[47]. সাপ্তাহিক দাওয়াহ-২১শে নভেম্বর-২০০২, রিয়াদ।

[48]. প্রাগুক্ত।

[49]. তিরমিযী, হাদীস নং ২৩২৫। সহীহ সনদে।

সংকলন: মোঃ আব্দুল কাদের

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

সূত্র: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব

http://www.healthprose.org/ http://www.handlestresshelp.com/
https://www.hillsfarmacy.com/
http://www.ambienonlinebuycheap.com/